খেলার মত খেলা

সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৭০
প্রকাশ করেছেন
অমিয় কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট
কলকাতা ১২
ছেপেছেন
পার্বতীচরণ রায়
দি গৌতম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯ এ, বিধান সরনী
কলকাতা ৬

'খেলার মত খেলা' প্রকাশিত হল।

ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন বিষয়ের এমন কয়েকটি প্রতিযোগিতার কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, উত্তেজনায়, নাটকীয়তায়, ক্রীড়াশৈলীর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দিক দিয়ে যেগুলো সাধারণ পাঠকদের এবং ক্রীড়ামোদীদের বিশেষ করে আকর্ষণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ ধরনের বই কখনও সম্পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। তবুও যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে (গ্রন্থের আকারের দিকে দৃষ্টি রেখে) যাতে জনপ্রিয় খেলাগুলোর কথাই বিশেষ করে স্থান পায়। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, আথলেটিকস্ ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। তথ্যের দিক দিয়ে যাতে সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

বরণীয় দিনের স্মরণীয় খেলা

ক্রিকেট-জগতে সেরা ম্যাচ কোন্‌টা ?

এই একটি প্রশ্ন আমাদের প্রত্যেকের মনেই একবার না একবার উঁকি মারে। এই প্রশ্নটির মোহিনী শক্তির হাত আমরা চেষ্টা করেও এড়াতে পারি না। যাঁরা বহুদিন ধরে ক্রিকেট খেলা দেখছেন কিংবা ক্রিকেট সম্বন্ধে পড়ছেন তাঁরা একটি সেরা খেলার কথা ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলেন। যারা একেবারে নতুন, তারা হাতড়িয়ে বেড়ায় অল্প কয়দিনের সামান্য ক-টি খেলার ভিতরে।

তবু প্রশ্নটি থেকে যায়। একটি প্রকাণ্ড বড় জিজ্ঞাসা-চিহ্ন আমাদের চোখের সামনে জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকে—ক্রিকেট-জগতে সেরা ম্যাচ কোন্‌টা ?

এই প্রশ্নের উত্তর ক্রিকেটামোদী প্রত্যেকেই—তিনি খেলোয়াড়ই হোন, সাংবাদিকই হোন কিংবা নিছক সাধারণ দর্শকই হোন—নিজের মতানুযায়ী দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সেরা ম্যাচ বলতে টেস্ট খেলাকেই বোঝায় এবং যে-টেস্ট খেলায় একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খেলার ফলাফল বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে, তাকেই সেরা ম্যাচ বলা হয়।

কথাটার মধ্যে কিছুটা সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু খেলার শেষ ফলাফলের অনিশ্চয়তাই শুধু কোন খেলাকে ভাল বা সেরা খেলায় সব

সময়ে উন্নীত করতে পারে না। আবার, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিরক্তিকর খেলার পর একেবারে শেষ মুহূর্তের তীব্র প্রতিযোগিতা বা উত্তেজনাও সেরা খেলা বলে স্বীকৃত হতে পারে না।

শেষ মুহূর্তের উত্তেজনামূলক টেস্ট খেলার কয়েকটা ভাল উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

এক : ১৮৮২ সনের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া ৭ রানে জয়লাভ করে।

দুই : ১৮৯৪-৯৫ সনের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট। ফলো অন করেও শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ১০ রানে জয়লাভ করে।

তিন : ১৯০২ সনের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠের টেস্ট ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৩ রানে জয়লাভ করে।

চার : ১৯০২ সনের ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ওভাল মাঠের টেস্ট ম্যাচ। ইংল্যাণ্ড ১ উইকেটে জয়লাভ করে।

পাঁচ : গিলিগানের টেস্ট দলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ১১ রানে জয়লাভ।

ছয় : ১৯৬০-৬১ সনে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সেই বিখ্যাত 'ড্র' —একেবারে 'টাই' ফলাফল। দু-দলেরই মোট সমান সমান রান।

এই শেষ খেলাটিকেই বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট ম্যাচ বলে অভিহিত করা হয়, কারণ শেষ মুহূর্তের উত্তেজনা প্রতিটি খেলোয়াড় এবং দর্শককে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে বহুদিন সেই স্মৃতি উপস্থিত সকলের মনে সমুজ্জ্বল থাকবে।

যাঁরা বহুদিন ধরে নিরাসক্ত মনে ক্রিকেট খেলা দেখে আসছেন, তাঁরা কিন্তু এই 'টাই-ড্র' টেস্ট ম্যাচটিকে শ্রেষ্ঠ খেলার সম্মান দিতে চান না। তাঁদের দৃষ্টি চলে যায় আরও অতীতে, আরও ত্রিশ বছর আগে।

উত্তেজনাও নয়, ফলাফলের শেষ মুহূর্তের অনিশ্চয়তাও নয়—অস্ট্রেলিয়া সেই টেস্ট ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রায় সহজেই সাত উইকেটে বিজয়ী হয়েছিল—কিন্তু তবু সবদিক জড়িয়ে টেস্ট ম্যাচের ইতিহাসে ১৯৩০ সনের লর্ডসের মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার সেই খেলাটি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট ম্যাচ হিসেবে আজও স্বীকৃত হয়ে আছে।

শ্রেষ্ঠ খেলা এবং ক্রিকেট-জগতে মহাকাব্যের মত গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী হওয়ার সমস্ত রকম মহৎ গুণই এই খেলাটির মধ্যে নিহিত ছিল। বর্তমান যুগের মত পাঁচ দিন বা ছয় দিন খেলেও ফলাফলহীন সে খেলা নয়, মাত্র চার দিনের খেলাতেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি দর্শককে সৌন্দর্যময় ক্রীড়ালোকের এক অনির্বচনীয় সুখ-সঙ্গমে নিয়ে গিয়েছিল।

সে যুগই ছিল ক্রিকেটের মহত্তম যুগ। দুই দলে যে-সব খেলোয়াড় খেলেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রুতকীর্তি এবং দিকপাল খেলোয়াড়ই শুধু নন—ক্রিকেট-জগতের রূপকথার এক একজন রাজপুত্র তাঁরা। খেলার মাধুর্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রত্যেকেই দর্শকচিত্তহারী, প্রত্যেকেই অনন্য। এই যুগের অনন্যপ্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে এই ১৯৩০ সনেই ইংল্যাণ্ডের মাঠে এমন এক তরুণ ব্যাট্‌স্‌ম্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, যিনি শুধু যে অতীত যুগের ক্রিকেট-সম্রাট ডব্লু, জি, গ্রেসের রাজত্ব নিজের অনস্বীকার্য প্রতিভাবলে জয় করে নিলেন তা নয়—আজও পর্যন্ত যিনি সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যান বলে স্বীকৃত হয়েছেন। এই তরুণ ব্যাট্‌স্‌ম্যানের নাম—ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান।

ইংল্যাণ্ডের দলে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন চির-তরুণ সাতচল্লিশ বৎসর বয়স্ক বিরাট প্রতিভাধর জ্যাক হব্‌স্‌, ছিলেন ব্র্যাডম্যানের প্রায় সমকক্ষ ব্যাট্‌স্‌ম্যান দলীপ সিংজী, ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন পার্সি চ্যাপম্যান—যেমন ব্যাটিং সেইরকম ফিল্ডিং, ছিলেন ইংল্যাণ্ডের সর্বকালের দুই শ্রেষ্ঠ অল রাউণ্ডার ফ্র্যাঙ্ক উলি এবং ওয়ালি হ্যামণ্ড, ছিলেন সমস্ত রকম উইকেটের শ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যান প্যাট্‌সি হেনড্রেন এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উইকেট কীপার জর্জ ডাকওয়ার্থ। রোলারদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মিডিয়াম ফাস্ট বোলার মরিস্‌ টেট, দুরন্ত ফাস্ট বোলার গাব্বি অ্যালেন এবং বিভ্রান্তকারী স্পিন বোলার রবিন্‌স্‌ ও হোয়াইট। শুধু এই দল থেকে একটি স্মরণীয় নাম বাদ পড়ে গেল—হব্‌সের ওপেনিং পার্টনার হার্বার্ট সাটক্লিফ; কিন্তু সাটক্লিফ আহত, তাঁরই পরিবর্তে এলেন উলি।

আর অস্ট্রেলিয়ার দলে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ওপেনিং

জুটি—ক্যাপ্টেন উডফুল এবং পন্সফোর্ড, পৃথিবীর অবিসম্বাদী সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্স্ম্যান ব্র্যাডম্যান—যদিও তখনও তাঁর ততটা নাম হয় নি, ব্যাটিং-এর স্টাইলের রাজা কিপ্যাক্স এবং আর এক অদ্বিতীয় তরুণ ব্যাট্স্ম্যান ম্যাককেব, ছিলেন উডফুলের পরবর্তী অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন ভিক রিচার্ডসন, ছিলেন 'প্রিন্স অব্ উইকেট কীপার্স' বার্ট ওল্ডফীল্ড। বোলিং-এ ছিলেন উপকথার চার্লি গ্রিমেট—দুই দশক ধরে যিনি তাঁর লেগ স্পিন ও গুগলি বলে বিপক্ষদলকে সম্মোহিত এবং আতঙ্কিত করে রেখেছিলেন এবং যাঁকে আজও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লেগ স্পিনারের মর্যাদা হয়। অস্ট্রেলিয়া দলে অবশ্য ছিল না কোন কিংবদন্তীর ফাস্ট বোলার।

তাছাড়া ইংল্যাণ্ড দলে ছিলেন তিনজন যাঁরা পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন হয়েছেন—হ্যামণ্ড, অ্যালেন ও রবিন্স্, এবং অস্ট্রেলিয়া-দলে রিচার্ডসন ও ব্র্যাডম্যান।

নাম-ডাকের দিক দিয়ে ইংল্যাণ্ড দল নিশ্চয়ই ছিল শ্রেষ্ঠ, প্রতিটি খেলোয়াড়ই ছিলেন সে যুগের এক একজন ধুরন্ধর। অস্ট্রেলিয়া দল সেদিক দিয়ে জৌলসহীন, ম্লান। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দলের মাত্র দুজন খেলোয়াড়—একজন ব্যাট্স্ম্যান এবং একজন বোলার—সবকিছু ওলট-পালট করে দেবার ক্ষমতা রাখতেন। তাঁরা হচ্ছেন ব্র্যাডম্যান এবং গ্রিমেট। এঁদের তুল্য কোন খেলোয়াড়ই ছিলেন না ইংল্যাণ্ড দলে। দলীপ সিং ব্র্যাডম্যানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, কিন্তু তিনি ব্র্যাডম্যান ছিলেন না। তাঁর ক্রিকেট-জীবনও অতি সংক্ষিপ্ত। অসুস্থতার জন্য ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ না করলে তিনি শেষ পর্যন্ত ব্র্যাডম্যানের সমকক্ষ হয়ত হলেও হতে পারতেন। ব্র্যাডম্যানের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্য ছিলেন হ্যামণ্ড,—কিন্তু প্রতিভার দিক দিয়ে তিনি ব্র্যাডম্যানের সমকক্ষ ছিলেন না। সময় নিয়ে ধীরে ধীরে হ্যামণ্ড তাঁর রান-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতেন, আর ব্র্যাডম্যান ঝড়ের গতিতে রান লুটে নিয়ে আসতেন। গ্রিমেটের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হোয়াইট, যিনি গত বৎসর অস্ট্রেলিয়া সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের পরম ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু হোয়াইট গ্রিমেটের প্রতিভার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারতেন না।

আগেই বলেছি যে সাটক্লিফের পরিবর্তে উলিকে দলভুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ইংল্যাণ্ডের প্রথম একাদশে তাঁর স্থান হয় না। ওপেনিং ব্যাট্‌স্‌ম্যান না হয়েও যাঁকে ওপেনিং ব্যাট্‌স্‌ম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, তাঁর খেলার কৃতিত্ব তখনই স্বীকৃত। উলির মত এমন মহিমময়, এমন প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় খুব কমই দেখা গিয়েছে; কিন্তু নির্বাচক-মণ্ডলীর তিনি কোনদিনই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন না। তাঁর খেলার গুণেই তাঁকে বাধ্য হয়ে দলভুক্ত করতে হত এবং নির্বাচকমণ্ডলী যে-কোন অজুহাতে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। ইংল্যাণ্ড দলে তাঁর চেয়ে ভাল ব্যাটসম্যান ছিলেন একমাত্র জ্যাক হব্‌স্‌।

১৯০৯ সন থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত পর-পর বাহান্নটি টেস্ট ম্যাচে উলি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খেলেছিলেন। ১৯২৮ সনই তাঁর সবচেয়ে গৌরবের বছর। সেই বছরে তিনি মোট ৩,৩৫২ রান করেছিলেন—মাত্র একবারই এই রান-সংখ্যা অতিক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, সেই বছর অর্থাৎ ১৯২৮-২৯ সনের অস্ট্রেলিয়া সফরে উলিকে দলভুক্ত করা হল না। উলির প্রতি এই ইচ্ছাকৃত অবিচারে ইংল্যাণ্ডে তর্কের তুফান বয়ে গেল, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলী নির্বিকার, নীরব রইলেন। ১৯২৯ সনে দক্ষিণ আফ্রিকা এল ইংল্যাণ্ড সফরে। প্রথম দুটি টেস্টেও উলির ডাক পড়ল না, কিন্তু এই দুটি টেস্টে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিং বিপর্যয় দেখে আবার উলিকে শেষ দুটি টেস্ট ম্যাচে খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হল। আর সেই দুটি টেস্ট ম্যাচে তিনটি ইনিংসে তাঁর রান-সংখ্যা হল—৮৩, ৯৫ (নট আউট) এবং ১৫৪। সবচেয়ে বড় কথা, এই দুটি টেস্ট ম্যাচেই ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে।

১৯৩০ সনের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ট্রেন্ট ব্রিজের প্রথম টেস্ট খেলাতেও তাই আবার ডাক পড়েছিল উলির: কিন্তু ইংল্যাণ্ডের আর সকলে ভাল ব্যাট করলেও উলি বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্র্যাডম্যানের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে।

দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম টেস্টের সমস্ত খেলোয়াড়কেই নির্বাচিত করা হল, —এক উলি বাদে। উলির পরিবর্তে দলভুক্ত হলেন দলীপ সিংজী। কিন্তু

সাটক্লিফ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওপেনিং ব্যাট্‌স্‌ম্যানের সমস্যা দেখা দিল। আবার ডাক পড়ল উলির। সাটক্লিফের বদলে হব্‌সের সঙ্গে প্রথম জুটিতে খেলবেন উলি। তাঁর জীবনের ৬৪টি টেস্ট ম্যাচে এই প্রথম এবং শেষ বার তিনি দলের ইনিংস 'ওপেন' করলেন।

২৭শে জুন শুরু হল এক অবিস্মরণীয় টেস্ট খেলা। দুই ইনিংস মিলিয়ে ইংল্যাণ্ড করেছিল ৮০০ রান; তবু মাত্র চার দিনের এই খেলাতে তারা পরাজিত হয়েছিল। কারণ, অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছিল অবিশ্বাস্য ৭২৯ রান—টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর রেকর্ড। আর এই টেস্টে প্রথম খেলতে নেমে দলীপ সিংজী সেঞ্চুরি করেন।

২৭শে জুন সকালবেলায় দুই দল তাঁদের টীম ঘোষণা করলেন:

ইংল্যাণ্ড: হব্‌স্‌, উলি, হ্যামণ্ড, দলীপ সিংজী, হেনড্রেন, চ্যাপম্যান (ক্যাপ্টেন), অ্যালেন, টেট, রবিন্‌স্‌, হোয়াইট, ডাকওয়ার্থ (উইকেট কীপার)।

অস্ট্রেলিয়া: উডফুল (ক্যাপ্টেন), পন্সফোর্ড, ব্র্যাডম্যান, কিপ্যাক্স, ম্যাককেব, রিচার্ডসন, ওল্ডফীল্ড (উইকেট কীপার), গ্রিমেট, হর্নিব্রুক, ওয়াল, ফেয়ারফ্যাক্স।

চ্যাপম্যান টসে জিতে ব্যাট করাই স্থির করলেন।

ব্যাট হাতে নামলেন হব্‌স্‌ এবং উলি। ওয়ালের বলের মুখোমুখি হলেন হব্‌স্‌। ওয়ালের ফাস্ট বল দেখে শুনে ব্লক করে খেলে গেলেন তিনি। ওয়ালের প্রথম ওভার হল 'মেডেন'। অপর দিক দিয়ে বল দিতে এলেন ফেয়ারফ্যাক্স। প্রথম বলটিকেই চোখের নিমেষে কভার পয়েণ্ট দিয়ে উলি বাউণ্ডারিতে পাঠালেন। এদিকে পর-পর দুটি মেডেন ওভার পেলেন ওয়াল। আর এই সময়ে তিনটি বাউণ্ডারি মেরে উলি করেছেন ১২। পরের ওভারে ১ রান করে হব্‌স্‌ মুখোমুখি হলেন ফেয়ারফ্যাক্সের। কিন্তু আর কিছু করতে পারলেন না। সেই ওভারেই ফেয়ারফ্যাক্সের বল খোঁচা মেরে হব্‌স্‌ ওল্ডফীল্ডের হাতে ক্যাচ তুলে দিলেন। ইংল্যাণ্ডের ১ উইকেটে ১৩ রান।

এলেন হ্যামণ্ড। তাঁর চিরকালের স্বভাবমত দেখে শুনে ধীরে সুস্থে রান

করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে খেলেই গত সফরে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে প্রচুর রান করেছেন, এখানেও সেই নেশা পেয়ে বসল। কিন্তু অপর দিকে উলি বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে দর্শক-চিত্ত জয় করে নিয়েছেন। ৪০ মিনিটে করেছেন ৪১ রান, প্রতি মিনিটে এক রান করে তুলেছেন তিনি। ফেয়ারফ্যাক্সের একটি খাটো লেংথের বলকে উলি স্কোয়ার কাট করলেন। বলটি তীব্রগতিতে গোড়ালির সমান উঁচু হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। নিজের পা বাঁচানোর জন্যই বোধহয় ওয়াল নিচু হয়ে হাত পেতে দিলেন এবং সেই সামান্য-উঁচু বলটি কামানের গোলার মত ছুটে এসে ওয়ালের হাতের মধ্যে আটকিয়ে গেল। ৫২ রানে ইংল্যাণ্ডের ২ উইকেট।

পিচ ছিল ফাস্ট বোলারদের জন্যই তৈরি—ওয়াল এবং ফেয়ারফ্যাক্স বলও ভালই দিচ্ছিলেন, তবু উডফুল গ্রিমেটকে নিয়ে এলেন। এদিকে ব্যাট করতে নামলেন দলীপ সিংজী। গ্রিমেটের বলের জাতুতে অতি সহজেই হ্যামণ্ড আউট হয়ে গেলেন! ইংল্যাণ্ডের তখন ৩ উইকেটে ১০৫ রান।

এবার নামলেন হেনড্রেন। দলীপ সিংজী এবং হেনড্রেন তুজনেই বুঝতে পারলেন যে ইংল্যাণ্ডের একমাত্র ভয় হচ্ছে এই ছোটখাটো ভাল-মানুষের মত দেখতে গ্রিমেটকে। স্পিন এবং ফ্লাইটের আশ্চর্য চাতুরীতে, ব্যাট্‌স্‌ম্যান বুঝে বল উঁচু বা নিচু করে ফেলে এবং সেইসঙ্গে মাঝে-মাঝে ভীতিপ্রদ গুগলি বল দিয়ে তিনি ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের কোণঠাসা করে রেখেছিলেন। সুতরাং দলীপ সিংজী এবং হেনড্রেন গ্রিমেটের বলকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ব্যাট করতে শুরু করলেন। গ্রিমেটের বলকে সমীহ করে খেললেই তিনি পেয়ে বসবেন, সুতরাং তু-জনের ব্যাটই 'মার মার' করে উঠল। দেড় ঘণ্টায় এঁদের তুজনের জুটিতে রান হল ১০৪। উডফুল চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গ্রিমেটই তাঁর রঙের তুরুপ, অথচ সেই গ্রিমেটকে এই তুই ব্যাট্‌স্‌ম্যান প্ল্যান করে বেকার করবার চেষ্টা করছেন। নিরুপায় হয়ে ২০৯ রানের মাথায় উডফুল নতুন বল নিলেন। আবার বল দিতে এলেন ওয়াল এবং ফেয়ারফ্যাক্স।

সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল। ওই রান-সংখ্যার মাথাতেই ফেয়ারফ্যাক্সের বলে ম্যাককেবের হাতে কট্‌ আউট হলেন হেনড্রেন ৪৮ রান করে।

চ্যাপম্যান ওয়ালের বলে ওল্ডফীল্ডের হাতে মাত্র ১১ রান করে আউট হলেন। অ্যালেন গেলেন ৩ রান করে ফেয়ারফ্যাক্সের বলে বোল্‌ড্‌ আউট হয়ে। নতুন বল নেওয়ার আগে ইংল্যাণ্ডের রান-সংখ্যা ছিল ৩ উইকেটে ২০৯, এখন ৬ উইকেটে ২৩৬ রান। মাত্র ২৭ রানে তিনটি উইকেট পড়ে গেল।

এবার এলেন মরিস টেট—সুবিখ্যাত বোলার। তিনি ব্যাট সোজা করে ধরে বল আটকিয়ে যেতে লাগলেন এবং সুবিধা পেলেই গায়ের জোরে মারতে লাগলেন। দলীপ সিংজী এবং টেটের জুটিতে রান হল ৯৮। শেষ পর্যন্ত ৫৪ রান করে ওয়ালের বলে আউট হয়ে গেলেন টেট। এবারে দলীপ সিংজী বেপরোয়া ব্যাট চালালেন। সেইদিনের খেলার শেষ মুহূর্তে দলীপ সিংজী আউট হলেন ১৭৩ রান করে। টেস্ট ম্যাচে প্রথম অবতীর্ণ হয়েই সেঞ্চুরি।

কিন্তু মাঠের বাইরে প্যাভিলিয়নের ভিতরে আর এক নাটক তখন জমে উঠেছিল। নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান লেভসন গাওয়ার, ম্যাকলারেন এবং ওয়ার্নার ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন চ্যাপম্যানের বোকামির জন্য মাথার চুল ছিঁড়ছিলেন। মাত্র চারদিনের টেস্ট! সারাদিন যদি ইংল্যাণ্ডই খেলে গিয়ে রানের সংখ্যা ফাঁপিয়ে তোলে, তবে আর অস্ট্রেলিয়াকে দু-দুবার আউট করবে কী করে? সাড়ে তিনশো রান যখন হয়েই গিয়েছে তখন ইংল্যাণ্ডের ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিয়ে পড়ন্ত বেলায় অল্প আলোতে অস্ট্রেলিয়ার দু-একটা উইকেট ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা চ্যাপম্যানের উচিত ছিল। সেদিন খেলার শেষে ম্যাকলারেন স্পষ্টই চ্যাপম্যানকে এই কথাটা জানালেন। অস্ট্রেলিয়া দলের চেয়ে ইংল্যাণ্ডের দল সর্ববিষয়ে অনেক ভাল; সহজ জয়কে ড্র-তে টেনে নিয়ে যাওয়ার এই কষ্টকর চেষ্টা কেন? প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করেছে, দ্বিতীয় টেস্টেও ইংল্যাণ্ড সহজেই জয়লাভ করবে।

চ্যাপম্যান কোন উত্তর দিতে পারেন নি, ভর্ৎসনা শুনে মুখ নিচু করে ছিলেন। সেই রাত্রির মত ইংল্যাণ্ডের তিন ক্রিকেট-পণ্ডিত—লেভসন-গাওয়ার, ম্যাকলারেন এবং ওয়ার্নার—নিজেদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমত

নিয়েই ঘরে ফিরলেন ; কিন্তু পরের দিন শনিবার এবং সোমবার এই খেলা দেখার পর তাঁদের মুখে আর রা ফুটল না। চ্যাপম্যানকে ভর্ৎসনা করার জন্য লজ্জায় আর তাঁরা মুখ দেখাতে পারেন না। সাড়ে তিনশো কেন— ছয়শো রানের আগে ইনিংস শেষ হয়ে যাওয়ার কল্পনাতে যেন তাঁদের শরীর ভয়ে কাঁপতে লাগল।

পরের দিন ইংল্যাণ্ড আউট হয়ে গেল মোট ৪২৫ রান করে। পরাজয় তো নয়ই, বরং জয়ের সুনিশ্চিত আশা নিয়েই ইংল্যাণ্ড দল ফীল্ডিং করতে নামল। অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে ব্যাট করতে নামলেন উডফুল এবং পন্সফোর্ড।

সমস্ত রকমের বলকে অগ্রাহ্য করে উডফুল এবং পন্সফোর্ড ধীরে সুস্থে ব্যাট করে যেতে লাগলেন। প্রথম টেস্টে পরাজয়ের কথা তাঁরা ভুলতে পারেন নি, দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ইংল্যাণ্ডের রানও বেশ ভীতিকর —৪২৫। এই টেস্টে জয়ের প্রয়োজন নেই, শুধু পরাজয়ের হাত এড়ানো চাই। দলের মধ্যে অভিজ্ঞ ব্যাট্‌স্‌ম্যান বলতে মাত্র তাঁরা দু-জন—বাদবাকি চারজন ব্যাট্‌স্‌ম্যান—ব্র্যাডম্যান, কিপ্যাক্স, ম্যাককেব আর রিচার্ডসন—অনভিজ্ঞ এবং তরুণ।

অস্ট্রেলিয়া দলের শ্রেষ্ঠ ওপেনিং জুটি উডফুল ও পন্সফোর্ডকে কিছুতেই কাবু করা গেল না। চৌকস ব্যাটিং-এ তাঁরা সুন্দরভাবে রান তুলে যেতে লাগলেন। অবলীলায় তাঁদের জুটিতে একশো রান হল, দেড়শো রান হতেও সময় লাগল না। ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন বোলার পরিবর্তন করে করে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেলেন। ইংল্যাণ্ডের বাঘা বাঘা বোলাররা যখন কিছুই করতে পারলেন না, তখন ইংল্যাণ্ড দলের সাহায্যে নামলেন ইংল্যাণ্ডের নরপতি রাজা পঞ্চম জর্জ স্বয়ং।

অবশ্য পঞ্চম জর্জ মাঠে নামলেন দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হতে, তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করতে। এই বিরতিতে পন্সফোর্ডের মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। হোয়াইটের বলে তিনি ৮১ রান করে হ্যামণ্ডের হাতে একটি সহজ ক্যাচ তুলে দিলেন। অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম উইকেট পড়ল ১৬২ রানে। উডফুল নট আউট ৭২।

এবার নামলেন ব্র্যাডম্যান।

ইংল্যাণ্ডের গত অস্ট্রেলিয়া সফরে হোয়াইট অস্ট্রেলিয়ার ব্যাট্স্ম্যানদের নাচিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তাঁর বলকে সকলেই অত্যন্ত সমীহ করে খেলার জন্য ব্যাট্স্ম্যানরা হোয়াইটের বলে সহজেই আউট হয়ে গিয়েছিলেন। হোয়াইট তখন অস্ট্রেলিয়া দলের কাছে বিভীষিকা-স্বরূপ। ব্র্যাডম্যান তাই বোধহয় এই হোয়াইট-ভীতি দূর করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। হোয়াইটকে তিনি কিছুতেই ব্যাট্স্ম্যানের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেবেন না।

ব্র্যাডম্যান সাধারণত খেলা শুরু করতেন ধীরে সুস্থে, বল দেখে খেলে ; —তারপর একবার হাত জমে গেলে ব্যাটের তীব্র দ্যুতিতে সারা মাঠ ঝলসিয়ে দিয়ে। কিন্তু সেই শনিবার ২৮ শে জুন যেন এক নতুন ব্র্যাডম্যান ক্রিকেট খেলতে লর্ডসের মাঠে নামলেন।

হোয়াইট বল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্র্যাডম্যান ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বলটিকে ফুল টসে নিয়ে সজোরে বাউণ্ডারিতে পাঠালেন। এই ধরনের মারের জন্য হোয়াইট একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। হোয়াইটের স্পিন বলকে এইভাবে মারা উডফুলের কাছেও হঠকারিতা বলে মনে হল। তিনি ব্যাট দিয়ে পিচ ঠিক করতে করতে ব্র্যাডম্যানকে দেখে শুনে সাবধানে খেলতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু ব্র্যাডম্যান সেদিন হোয়াইটের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যেন। উডফুলের উপদেশ তিনি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলেন। অন্যান্য বোলারদের বল তবুও একটু সমীহ করে খেললেন, কিন্তু হোয়াইটের বলের মুখোমুখি হলেই তিনি তাঁকে যেন এক তৃতীয় শ্রেণীর বোলারের মত একেবারে তাচ্ছিল্য করে ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বল মারতে লাগলেন। ব্র্যাডম্যানের এই নিরুদ্বেগ সহজ আক্রমণে হোয়াইটের ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস কমে যেতে লাগল। আগে ব্যাট্স্ম্যানরা হোয়াইটের বলের সামনে দাঁড়ালে ভয়ে কাঁপতেন, এখন তরুণ ব্র্যাডম্যানের ব্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীণ হোয়াইট কাঁপতে লাগলেন। চ্যাপম্যান হোয়াইটকে ব্র্যাডম্যানের কাছ থেকে আড়াল করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে

লাগলেন। ব্র্যাডম্যানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল, হোয়াইট এই ইনিংসে তাঁর স্বাভাবিক জাতুকরী বল করতে পারলেন না। এবারে অন্যান্য বোলারদের বিধ্বস্ত করার দিকে ব্র্যাডম্যান দৃষ্টি দিলেন।

আর এক দিক থেকে উডফুল বেশ নিশ্চিন্ত মনে ব্যাট করে যাচ্ছিলেন। ব্র্যাডম্যানের অবিস্মরণীয় ব্যাটিং প্রতিভার কাছে উডফুলের খেলা কিছুটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি সহজেই সেঞ্চুরি করলেন। তিন ঘণ্টা আগে তিনি ব্যাট করতে নেমেছিলেন, কিন্তু ব্র্যাডম্যান অতি সহজেই উডফুলের রান-সংখ্যা প্রায় ধরে ফেললেন। খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে রবিন্সের বলে ১৫৫ রান করে উডফুল স্টাম্পড্ আউট হয়ে গেলেন। ২ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার ৩৯৭ রান। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ২৩১ রান। ব্র্যাডম্যান ১৫৩ নট আউট।

লেভসন-গাওয়ার, ওয়ার্নার আর ম্যাকলারেন অস্ট্রেলিয়া দলের এই অবিশ্বাস্য খেলায় চিন্তিত মুখে বাড়িতে ফিরলেন। তাঁদের ধারণা ছিল উডফুল আর পন্সফোর্ডকে আউট করতে পারলেই অনভিজ্ঞ তরুণ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাট্স্ম্যানরা ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞ বোলারদের সহজ শিকার হয়ে পড়বে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ৪২৫ রানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার মাত্র তুই উইকেটে ৩৯৩ রান! তাঁরা চ্যাপমানকে সাহস দিলেন, নিজেদের মনকে প্রবোধ দিলেন—তবু উডফুল আর পন্সফোর্ড তো আউট হয়েছেন! অস্ট্রেলিয়ার আর কে-ই বা তাঁদের মত বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যাট করবেন?

সোমবার ব্যাট করতে নামলেন ব্র্যাডম্যান আর কিপ্যাক্স।

এঁদের তুজনের খেলা দেখে কে বলবে যে এঁরা তুজনেই তরুণ ব্যাট্স্ম্যান এবং তুজনেই প্রবল শক্তিশালী ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমেছেন? ইংল্যাণ্ডের বোলিংকে একেবারে তুচ্ছ করে তুজনেই যেন তুলোধোনা করতে লাগলেন। এখন যেন আর ইংল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, কিপ্যাক্স ও ব্র্যাডম্যানের মধ্যে ব্যাট চালানোর প্রতিযোগিতা। ব্র্যাডম্যান মহিমময় গৌরবের সঙ্গে খেলে যেতে লাগলেন, কিন্তু কিপ্যাক্সও পিছিয়ে রইলেন না। ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে

সমান গতিতে, সমান স্বাচ্ছন্দ্যে, সমান সৌন্দর্যে কিপ্যাক্সও প্রতিটি বল খেলে যেতে লাগলেন।

ব্র্যাডম্যান সেইদিন আরও ৯৯ রান করে মোট ২৫৪ রানে আউট হয়ে গেলেন। তিন উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার ৫৮৫ রান। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে রান ১৯২। কিপ্যাক্স আর খেলতে পারলেন না, তিনি আউট হয়ে গেলেন আর মাত্র তিন রান পরে ৮৩ রান করে। তারপর এলেন ম্যাককেব, রিচার্ডসন, ওল্ডফীল্ড এবং ফেয়ারফ্যাক্স—উডফুলের কাছ থেকে পিটিয়ে খেলার আদেশ নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ৭২৯ রান করে ডিক্লেয়ার করল।

ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে এত বেশি রান তখন পর্যন্ত আর কখনও হয়নি। ৭০০ রান হওয়ার পরে স্কোর-বোর্ডে ৭০০-র ৭ পাওয়া গেল না, পেস্ট-বোর্ডের ওপর হাতে ৭ লিখে কাজ চালাতে হল। একে টেস্ট ম্যাচ, তার ওপর ইংল্যাণ্ডের ফীল্ডিং অত্যন্ত উঁচু শ্রেণীর ছিল—তবুও অস্ট্রেলিয়া গড়ে ঘণ্টায় ৭০ রান করেছিল।

বিকেলের দিকে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামল। এখন তাদের চেষ্টা কোনমতে পরাজয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের। হব্‌স্‌ এবং উলি মন্থর গতিতে ব্যাট করতে লাগলেন; কিন্তু গ্রিমেটের মারাত্মক বলের সামনে তাঁদের এই আত্মরক্ষামূলক খেলা কার্যকরী হল না, তিনি তাঁদের দুজনের উইকেটই দখল করলেন। হ্যামণ্ড ও দলীপ সিংজী সোমবারের বিকেলটা কোনরকমে টিঁকে থাকলেন।

মঙ্গলবার সকালেই গ্রিমেট দখল করলেন হ্যামণ্ড ও হেনড্রেনের উইকেট, হর্নিব্রুক নিলেন দলীপ সিংজীকে। ১৪৭ রানে পাঁচ উইকেট। ইংল্যাণ্ডের সেরা ব্যাট্‌স্‌ম্যানরা সকলেই আউট। ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের মধ্যে এখন বাকি একমাত্র চ্যাপম্যান। ইংল্যাণ্ডের অবস্থা খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু একটি ভুলের জন্য খেলার রূপ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। শুরু হল এক আশ্চর্য নাটক। গ্রিমেটের গুগলি বুঝতে না পেরে চ্যাপমান কভারে একটা অতি সহজ ক্যাচ তুললেন। হাতের ব্যাট মাটিতে ঠুকে চ্যাপমান ক্রীজ ছেড়ে দলে যাচ্ছেন। বলটি আছে পন্সফোর্ড এবং

রিচার্ডসনের মাঝামাঝি, কিন্তু কেউ সেই সহজ ক্যাচ ধরার এতটুকু চেষ্টা করলেন না। ফলে চ্যাপম্যানের সে-যাত্রা ফাঁড়া কেটে গেল। চ্যাপম্যান ন্যাটা ব্যাট্‌স্‌ম্যান, তাই গ্রিমেটের লেগ ব্রেক তিনি অতি সহজেই খেলতে পারলেন। অ্যালেনও যেন হঠাৎ ব্যাটিং-এর ক্ষমতা ফিরে পেলেন। পরাজয় যখন নিশ্চিত, তখন হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোন মানে হয় না। দুজনেই আক্রমণাত্মক খেলা খেলতে লাগলেন। অ্যালেন ৫৭ রান করে আউট হলেন, কিন্তু সেঞ্চুরি করলেন চ্যাপম্যান।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যাণ্ড ৩৭৫ রান করল।

৭২ রান করতে পারলে জয়লাভ। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামল। চার দিনে তিনটি ইনিংস খেলা, এবং ১১০০ রানের পর পিচের অবস্থা খুব খারাপ। পিচে প্রথম থেকেই স্পিন ধরছিল। এই খেলায় হঠাৎ প্রাণ সঞ্চার করলেন রবিন্‌স্‌।

পঞ্চম ওভারেই চ্যাপম্যান রবিন্‌স্‌কে বল করতে দিলেন। প্রথম বলেই রবিন্‌স্‌ উডফুলকে প্রায় আউট করে ফেলেছিলেন। উডফুল মিড-অনে ক্যাচ তুললেন, কিন্তু সে ক্যাচ কেউ ধরল না। উডফুল ছুটে এক রান করলেন। পরের বলে পন্সফোর্ড মুখোমুখি হলেন রবিন্‌সের এবং সেই বলেই তিনি বোল্ড আউট হয়ে গেলেন। এদিকে টেটের বলে ব্র্যাডম্যান লেট কাট করার সঙ্গে সঙ্গেই চ্যাপম্যান তাঁকে চমৎকারভাবে লুফে নিলেন।

১৬ রানে এক উইকেট। ১৭ রানে দুই উইকেট। নাটক জমে উঠছে।

রবিন্‌সের বলে কিপ্যাক্স ডাকওয়ার্থের হাতে আটকে গেলেন। ২২ রানে তিন উইকেট।

কিন্তু এইখানেই নাটকের পরিসমাপ্তি। ম্যাককেব আর উডফুল দেখে শুনে খেলতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়ের মার মারলেন ম্যাককেব।

অস্ট্রেলিয়া সাত উইকেটে বিজয়ী হল।

স্কোর-বোর্ড

ইংল্যাণ্ড (প্রথম ইনিংস)

হব্‌স্‌	ক	ওল্ডফীল্ড	ব	ফেয়ারফ্যাক্স	১
উলি	ক	ওয়াল	ব	ফেয়ারফ্যাক্স	৪১
হ্যামণ্ড			ব	গ্রিমেট	৩৮
দলীপ সিংজী	ক	ব্র্যাডম্যান	ব	গ্রিমেট	১৭৩
হেনড্রেন	ক	ম্যাককেব	ব	ফেয়ারফ্যাক্স	৪৮
চ্যাপম্যান	ক	ওল্ডফীল্ড	ব	ওয়াল	১১
অ্যালেন			ব	ফেয়ারফ্যাক্স	৩
টেট	ক	ম্যাককেব	ব	ওয়াল	৫৪
রবিন্‌স্‌	ক	ওল্ডফীল্ড	ব	হর্নিব্রুক	৫
হোয়াইট	নট আউট				২৩
ডাকওয়ার্থ	ক	ওল্ডফীল্ড	ব	ওয়াল	১৮
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগবাই ৭, নো বল ১)					১০
					৪২৫

উইকেট পতন : ১।২৩, ২।৫২, ৩।১০৫, ৪।২০৯, ৫।২৩৬, ৬।২৩৯, ৭।৩৩৭, ৮।৩৬৩, ৯।৩৮৭, ১০।৪২৫।

বোলিং	ও	মে	রা	উ
ওয়াল	২৯·৪	২	১১৮	৩
ফেয়ারফ্যাক্স	৩১	৬	১০১	৪
গ্রিমেট	৩৩	৪	১০৫	২
হর্নিব্রুক	২৬	৬	৬২	১
ম্যাককেব	৯	১	২৯	০

অস্ট্রেলিয়া (প্রথম ইনিংস)

উডফুল	স্টা	ডাকওয়ার্থ	ব	রবিন্‌স্‌	১৫৫
পন্সফোর্ড	ক	হ্যামণ্ড	ব	হোয়াইট	৮১
ব্র্যাডম্যান	ক	চ্যাপম্যান	ব	হোয়াইট	২৫৪
কিপ্যাক্স		...	ব	হোয়াইট	৮৩
ম্যাককেব	ক	উলি	ব	হ্যামণ্ড	৪৪
রিচার্ডসন	ক	হব্‌স্‌	ব	টেট	৩০
ওল্ডফীল্ড	নট আউট				৪৩
ফেয়ারফ্যাক্স	নট আউট				২০
অতিরিক্ত (বাই ৬, লেগবাই ৮, ওয়াইড ৫)					১৯
		(৬ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)			৭২৯

উইকেট পতন ঃ ১।১৬২, ২।৩৯৩, ৩।৫৮৫, ৪।৫৮৮, ৫।৬৪৩, ৬।৬৭২ ।

বোলিং	ও	মে	রা	উ
টেট	৬৪	১৬	১৪৮	১
অ্যালেন	৩৪	৭	১১৫	০
হোয়াইট	৫১	৭	১৫৮	৩
রবিন্‌স্‌	৪২	১	১৭২	১
হ্যামণ্ড	৩৫	৮	৮২	১
উলি	৬	০	৩৫	০

ইংল্যাণ্ড (দ্বিতীয় ইনিংস)

হব্‌স্‌		...	ব	গ্রিমেট	১৯
উলি		...	ব	গ্রিমেট	২৮
হ্যামণ্ড	ক	ফেয়ারফ্যাক্স	ব	গ্রিমেট	৩২
দলীপ সিংজী	ক		ব	হর্নিব্রুক	৪৮
হেনড্রেন	ক		ব	গ্রিমেট	৯
চ্যাপম্যান	ক	ওল্ডফীল্ড	ব	ফেয়ারফ্যাক্স	১২১
অ্যালেন	এল, বি, ডব্লু.		ব	গ্রিমেট	৫৭
টেট	ক	পন্সফোর্ড	ব	গ্রিমেট	১০
রবিন্‌স্‌	নট আউট				১১
হোয়াইট	রান আউট				১০
ডাকওয়ার্থ	এল, বি. ডব্লু.		ব	ফেয়ারফ্যাক্স	০
অতিরিক্ত (বাই ১৬, লেগবাই ১৩, ওয়াইড ১)					৩০
					৩৭৫

উইকেট পতন : ১।৪৫, ২।৫৮, ৩।১২৯, ৪।১৪১, ৫।১৪৭, ৬।২৭২, ৭।৩২৯, ৮।৩৫৪, ৯।৩৭২, ১০।৩৭৫।

বোলিং	ও	মে	রা	উ
ওয়াল	২৫	২	৮০	০
ফেয়ারফ্যাক্স	১২.৪	২	৩৭	২
গ্রিমেট	৫৩	১৩	১৬৭	৬
হর্নিব্রুক	১৯	২	৪৯	১
ম্যাককেব	৩	১	১১	০
ব্র্যাডম্যান	১	০	১	০

অস্ট্রেলিয়া (দ্বিতীয় ইনিংস)

উডফুল	নট আউট		২৬
পন্সফোর্ড		ব রবিন্‌স্‌	১৪
ব্র্যাডম্যান	ক চ্যাপম্যান	ব টেট	১
কিপ্যাক্স	ক ডাকওয়ার্থ	ব রবিন্‌স্‌	৩
ম্যাককেব	নট আউট		২৫
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগবাই ২)			৩
	(৩ উইকেটে)		৭২

উইকেট পতন : ১।১৬, ২।১৭, ৩।২২।

বোলিং	ও	মে	রা	উ
টেট	১৩	৬	২১	১
রবিন্‌স্‌	৯	১	৩৪	২
হ্যামণ্ড	৪.২	১	৬	০
হোয়াইট	২	০	৮	০

চতুর্মুকুট

টেনিস-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার—গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম বা চতুর্মুকুটের অধিকারী হওয়া। একই বছরে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় সিঙ্গল্‌স্ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরবকেই বলা হয় গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম অর্জন।

টেনিস-জগতের ইতিহাসে মাত্র দু-জন টেনিস খেলোয়াড়ই এই অতুলনীয় সম্মান, এই বিশ্বজয়ী গৌরবের অধিকারী হতে পেরেছেন। প্রথমে হয়েছিলেন ১৯৩৮ সনে আমেরিকার ডোনাল্ড (ডন) বাজ এবং দ্বিতীয় তার চব্বিশ বছর পরে ১৯৬২ সনে অস্ট্রেলিয়ার রড্‌নি (রড) লেভার। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, যে-বছরে বাজ গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম বিজয়ী হন সেই বছরেই রড লেভারের জন্ম।

টেনিস-জগতে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী বা অবিস্মরণীয় টেনিস খেলোয়াড় কম জন্মগ্রহণ করেন নি। চিরকালের নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় উপকথার সেই 'বিগ' বিল টিল্ডেন, কিংবা টিলডেনের শেষ জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের সুবিখ্যাত 'থ্রি মাস্কেটীয়ার্স' লাকোস্তে, কোশে, বোরোত্রা (এবং ব্র্যামিলোঁ), কিংবা ফ্রেড পেরি, অস্টিন, এল্‌স্‌ওয়ার্থ ভাইন্‌স্ কিংবা বর্তমান যুগের এখন পর্যন্ত শেষ প্রতিভাধর টেনিস খেলোয়াড় জ্যাক ক্র্যামার—কেউ এই গৌরব অর্জন করতে পারেন নি। হয়ত এই গৌরবের অধিকারী হতে পারতেন আমেরিকার ববি রিগ্‌স্ কিংবা পাঞ্চো গোঞ্জালেস্,—কিন্তু রিগ্‌স্ খেলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল এবং গোঞ্জালেসের খেলার দাপট দেখে তাঁর খেলার একেবারে সূচনাতেই ক্র্যামার তাঁকে পেশাদারি মহলে টেনে নিলেন।

একদা টেনিস-জগতে অখণ্ড রাজত্ব করত আমেরিকা। ফ্রান্সের 'থ্রি

মাস্কেটীয়ার্স' সমবেত চেষ্টায় সেই রাজ্য অধিকার করে নিল। তারপর হাত বদলের পালা—আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা—তারপর অস্ট্রেলিয়ার অভ্যুত্থান। এখনও পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া তার অধিকৃত রাজ্য সবল মুঠিতে ধরে রয়েছে—সেই ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যানের যুগ থেকে।

ফ্র্যাঙ্ক সেজম্যান, অ্যাশলি কুপার, নীল ফ্রেজার, কেন্ রোজওয়াল, লিউ হোড ......

১৯৬০ সন থেকে উঠল একটি নতুন তারকা—রড্ লেভার। ১৯৬১ সনে তিনি টেনিস-জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু তাঁর সাথে বাদ সেধেছেন আর এক নতুন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়, রয় এমার্সন—১৯৬১ সনের আমেরিকার জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান।

১৯৬২ সনের জানুয়ারি মাস থেকেই রড লেভারের গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম বিজয়ী হওয়ার অভিযান শুরু হয়। ১৯৬১ সনে একটুর জন্য সেই গৌরব হাতছাড়া হয়ে যায়, এ বছরে হতে না পারলে আর হয়ত কোনদিন সম্ভব হবে না। টেনিস-তারকা একটির পর একটি উদয় হচ্ছে। লেভারের পর এসেছেন রয় এমার্সন। অস্ট্রেলিয়ার বাইরেও দু-একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঁকি মারছেন।

১৯৬২ সনের জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপের ফাইনালে উঠলেন রড লেভার আর রয় এমার্সন। ৩—১ সেটে লেভার এমার্সনকে পরাজিত করে চতুর্মুকুটের প্রথমটি ধারণ করলেন।

এরপর ইটালিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ। এই খেলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার মধ্যে ধরা হয় না, কিন্তু এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই ইউরোপের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, পরবর্তী প্রতিযোগিতাগুলির জন্য প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের খেলা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যায়। এই প্রতিযোগিতারও ফাইনালে উঠলেন লেভার এবং এমার্সন। এমার্সন প্রথমে ২—১ সেটে এগিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু লেভার শেষ পর্যন্ত নিজের খেলাকে আয়ত্তের মধ্যে আনতে সক্ষম হলেন। তীব্র আক্রমণে তিনি এমার্সনকে বিপর্যস্ত করে তুললেন, এমার্সন বেস-লাইন ছেড়ে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেলেন না। লেভার তাঁকে ৩-২ সেটে পরাজিত করলেন।

এইবার ফরাসী টেনিস প্রতিযোগিতা। লেভারের এখন একমাত্র ভয় তাঁরই সমদেশী তাঁরই সহ-খেলোয়াড় এমার্সনকে। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় এমার্সনই ফাইনালে তাঁর সম্মুখীন হচ্ছেন। লেভার স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে এমার্সনই আগামী দিনের বিশ্বজয়ী টেনিস খেলোয়াড়—ফাইনালে তাঁর সঙ্গে এমার্সন ছাড়া আর কারুর সাক্ষাৎ হবে না।

কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন মুলিগানকে ৩-২ সেটে, সেমিফাইনালে নীল ফ্রেজারকে ৩-২ সেটে পরাজিত করে লেভার ফাইনালে উঠলেন। আর অন্য দিক থেকে ফাইনালে উঠলেন এমার্সনও।

লেভারের বিজয়-অভিযানকে প্রতিহত করার জন্য এবার বদ্ধপরিকর এমার্সন। লেভারকে তিনি কিছুতেই তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে দেবেন না, লেভার আক্রমণ শুরু করার আগেই তিনি শুরু করবেন আক্রমণ। ফাইনালে খেলা আরম্ভ হতেই এমার্সন তাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত প্ল্যান অনুযায়ী মুহুর্মুহু আক্রমণ চালিয়ে লেভারকে একেবারে কোণঠাসা করে রাখলেন। লেভারকে একেবারে কোর্টে দাঁড়াতে দিলেন না। প্রথম দুটি সেট জয়লাভ করলেন এমার্সন। আপ্রাণ সংগ্রাম করে কোনমতে তৃতীয় সেটটি দখল করলেন লেভার।

দশ মিনিটের বিরতির পর নতুন উদ্যমে খেলতে লাগলেন এমার্সন। কোনরকমে আর একটি সেটে জয়লাভ করলেই তিনি চ্যাম্পিয়ান হবেন। লেভারের স্বপ্ন চূর্ণ হবার অপেক্ষায়। হঠাৎ যেন অলৌকিক শক্তি লেভারের দেহে ভর করল। এমার্সনের মাপা স্ম্যাশ, ভলিকে তুচ্ছ করে তিনিই এমার্সনের নেট আক্রমণ করলেন। চলল দু-জনের মরণপণ সংগ্রাম। সেই রুদ্রশক্তি লেভারের অমিত বিক্রমের কাছে পরাজিত হলেন রয় এমার্সন, বাকি দুটি সেটের মধ্যে একটি গেমেও তিনি জয়ী হতে পারলেন না। ৩-২ সেটে জয়লাভ করে লেভার চতুর্মুকুটের দ্বি-মুকুটধারী হলেন।

ফরাসী 'থ্রি মাস্কেটীয়ার্সে'র বৃদ্ধ বোরোত্রা এই খেলা দেখতে এসেছিলেন। খেলার শেষে তিনি লেভারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন—চতুর্থ সেটের মাঝামাঝি সময় থেকে তুমি যা খেলেছ তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।

তারপর উইম্বলডন। এইটাই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। কিন্তু এত সহজে আর লেভার কোন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন নি। একমাত্র কোয়ার্টার-ফাইনালেই ম্যানুয়েল সান্তানার কাছে তিনি যা বেগ পেয়েছিলেন। প্রথম সেট সান্তানা ১১-৯ গেমে জিতলেন। দ্বিতীয় সেটেও সান্তানা ৫-১ গেমে এগিয়ে ছিলেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। লেভার শেষ পর্যন্ত ৩-১ সেটে জয়লাভ করলেন।

সেমি-ফাইনালে ৩-০ সেটে পরাজিত করে লেভার উঠলেন ফাইনালে। অপর দিকে ফাইনালে উঠেছেন—এবার আর এমার্সন নয়, মার্টিন মুলিগান। মাত্র ৫৭ মিনিটের মধ্যে ৩-০ সেটে লেভার জয়লাভ করলেন। উইম্বলডনের ফাইনালে এর আগে শুধু ১৯৫৭ সনে লিউ হোড অ্যাশলি কুপারকে এর চেয়ে কম সময়ে অর্থাৎ মাত্র ৫৩ মিনিটে পরাজিত করতে পেরেছিলেন।

চতুর্মুকুটের ত্রিমুকুটধারী এখন রড লেভার। আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান-শিপে জয়লাভ করে তিনি ডোনাল্ড বাজের সম-গৌরবভাগী হতে পারবেন কি ?

এক মানসিক উত্তেজনা তাঁকে পেয়ে বসল। গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম বিজয়ী হবার স্বপ্ন না দেখলে কিংবা বিভিন্ন সংবাদপত্র সেই স্বপ্ন না দেখালে তিনি এরকম অস্থির হয়ে উঠতেন না। আর মাত্র একটি ধাপ—আমেরিকান চ্যাম্পিয়ানশিপ—তার পরেই সপ্তস্বর্গের অবারিত দ্বার। কিন্তু সেই ধাপ অতিক্রম করা—বিশেষত মানসিক এই অবস্থায় খুব কঠিন। রয় এমার্সন গত বৎসরের আমেরিকার চ্যাম্পিয়ান, এবং অত্যন্ত কৃতী খেলোয়াড়, তিনি এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। এমার্সনকে তিনি তিনটি ফাইনালে পরাজিত করেছেন, চতুর্থবার সম্ভব হবে কি ?

চতুর্থ মুকুটের কথা আর চিন্তা করবেন না—এই স্থির করে তিনি আমেরিকার ফরেস্ট হিলে খেলতে এলেন। কিন্তু মন থেকে এই চিন্তা দূর করে ফেলা যায় না। আমেরিকার সংবাদ-পত্র, রেডিও এবং টেলি-ভিশন তাঁকে রেহাই দেন না। সর্বত্রই এই একই আলোচনা—লেভার গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম জয়ী হতে পারবেন কি ?

সেইসঙ্গে চলে ডোনাল্ড বাজের সঙ্গে তাঁর তুলনা। বিল টিলডেনের মতে বাজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, এত বড় খেলোয়াড় হয় নি, হবেও না। লেভার কি বাজের মতই প্রতিভাধর?

মনে মনে ভীষণ দমে যান লেভার। বাজের জয়লাভ ছিল মাখনের মধ্যে গরম ছুরি চালানোর মতই অতি সহজ, কোন খেলোয়াড় বাজের ক্রীড়া-নৈপুণ্য বা প্রতিভার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হন নি। কিন্তু লেভারের বেলাতে তা নয়, তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ রয় এমার্সন।

মানসিক অশান্তি ও উত্তেজনায় তিনি ভাল করে অনুশীলন পর্যন্ত করতে পারেন না।

অস্ট্রেলিয়ায় তিনি ডানলপ কোম্পানিতে কাজ করেন। সেই ডানলপ কোম্পানির আমেরিকা-অফিসের সর্বপ্রধান অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন সুনামী টেনিস খেলোয়াড় আড্রিয়ান কুইস্ট ছুটে এসেছেন লেভারকে সাহায্য করতে; কিন্তু তিনিও লোকের মুখ, সংবাদ-পত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের আলোচনা বন্ধ করতে পারলেন না। কুইস্ট বুঝতে পারলেন—এরকম মানসিক অবস্থায় লেভারের চতুর্মুকুট জয়ী হওয়া একরকম অসম্ভব।

যেদিন প্রতিযোগিতা আরম্ভ ঠিক তার আগের দিন ফরেস্ট হিলের হোটেলের নিজের ঘরে বসে ছিলেন লেভার। অনুশীলন করতেও যান নি, এক অস্থির বিষাদে মন ভারাক্রান্ত। এই প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার মত মানসিক কাঠামোই আর তাঁর নেই।

ঠিক এই সময়ে একজন ভদ্রলোক তাঁর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখেই লেভার খুব ভয় পেয়ে গেলেন—নিশ্চয়ই উনি কোন সাংবাদিক হবেন, এবারে প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলবেন।

আতঙ্কিত হৃদয় নিয়ে তিনি সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। লম্বা, সুপুরুষ চেহারা, বয়সের ভারে মোটা, কিন্তু অত্যন্ত সক্রিয়। চুলে সামান্য পাক ধরেছে।

সেই ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম কি রডনি লেভার?

—হ্যাঁ,—ঢোক গিলে কোনরকমে উত্তর দিলেন লেভার।—আপনি?

—আমার নাম ডোনাল্ড বাজ,—উত্তর দিলেন ভদ্রলোকটি।

বিস্ময়াভিভূত হয়ে লেভার টেনিসের রূপকথার সেই রাজপুত্রের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এই সেই শ্রুতকীর্তি ডোনাল্ড বাজ, যাঁর সমকক্ষ টেনিস খেলোয়াড় আজ পর্যন্ত পৃথিবী দেখে নি!

বাজ এগিয়ে এসে স্তম্ভিত লেভারকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন--রড, আগে থেকেই তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি। আমার এই অভিনন্দন যেন ব্যর্থ না হয়।

বাজের বুকের ওপর মাথা গুঁজে ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললেন লেভার। —এ কী অনুগ্রহ! এ কী ভালবাসা! এ কী বিশ্বাস!

সান্ত্বনা দিলেন বাজ। বললেন—তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি, রড। এইভাবে কখনো অনুশীলন হয় না। সমস্ত রকম গালগল্প, আলাপ-আলোচনার বাইরে গিয়ে মনকে মুক্তি দাও। আমার আরও আগেই আসা উচিত ছিল। চল আমার সঙ্গে।

কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন—কোন প্রশ্ন করলেন না লেভার। স্বর্গাগত দেবতার হাত ধরে নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি হোটেল ছাড়লেন। কাউকে না জানিয়ে বাজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। ফরেস্ট হিল্‌স্ থেকে একশো মাইল দূরে ক্যাট্‌স্‌কিলের গ্রমিনজারের খেলার মাঠে লেভারকে নিয়ে বাজ নিজে মোটর গাড়ি চালিয়ে এলেন। এখানে হেভিওয়েট বক্সিং-এর চ্যাম্পিয়ানেরা অনুশীলন করেন। একেবারে নির্জন জায়গা। এই টেনিস কোর্টে লেভারকে নিয়ে হাজির করলেন।

বাজ বললেন—বড় টেনিস খেলা ছেড়ে দিয়েছি আজ তেইশ চব্বিশ বছর। তোমার সঙ্গে টেনিস খেলে পারব না। তবু এস, একটু প্র্যাকটিস করা যাক।

খেলা শুরু হল। প্রথম সেটে অতি সহজেই জিতলেন লেভার, কিন্তু দ্বিতীয় সেটে বাজ লেভারকে চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে ছাড়লেন। ছয় ফুট এক ইঞ্চি দীর্ঘ বাজ, লেভার মাত্র পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। বয়সের ভারে বাজ শ্লথগতি, লেভার অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি। লেভারের খেলার জোর মূলত টপ-

স্পিনে, কিন্তু বাজের জোর ফ্ল্যাট মারে। তাছাড়া বাজের অনন্নুকরণীয় সাজ্ঘাতিক ব্যাক হ্যাণ্ডের মারের ধার যেন এতটুকুও কমে নি।

তৃতীয় সেটে আবার জিতলেন লেভার, কিন্তু অতি কষ্টে। ছুটে গিয়ে বল ধরা বাজের পক্ষে কঠিন, কিন্তু বল আয়ত্তে পেলে বাজ তখনও যেন সেই ১৯৩৮ সনের বাজ।

খেলার শেষে বাজ বললেন—আর প্র্যাকটিসের প্রয়োজন নেই; টেনিস খেলায় জেতবার মত তোমার হাতে সব রকমের মার আছে। তোমাকে কেউ হারাতে পারবে না, মিছিমিছি মন খারাপ করো না।

তারপর সারা দিনরাত ধরে আজে-বাজে গল্প করে বেড়ালেন, লেভারকে নাচ-গানের আসরে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত রাত্রে খাওয়া দাওয়া আর ঘুম। পরদিন সকালে বাজ আবার লেভারকে ফরেস্ট হিল্‌সে পৌঁছিয়ে দিলেন। ততক্ষণে লেভারের মন অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে।

লেভারকে হোটেলে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন অষ্ট্রেলিয়া দলের কোচ হ্যারি হপম্যান, এবং আড্রিয়ান কুইস্ট। বাজের সঙ্গে লেভারকে ফিরতে দেখে তাঁরা দু-জনেই চমকিয়ে উঠলেন।

লেভারকে একান্তে ডেকে কুইস্ট জিজ্ঞাসা করলেন—বাজ কী বললেন?

—ভয় পেতে নিষেধ করলেন—উত্তর দিলেন লেভার।

—খেললে বাজের সঙ্গে?

—হ্যাঁ। অদ্ভুত ভাল খেলোয়াড়, তার চেয়েও ভাল মানুষ।

ফাইনাল পর্যন্ত লেভারের বেগ পেতে হয় নি। ফ্র্যাঙ্ক ফ্রোয়েলিং, অ্যাণ্টোনিও প্যালাফ্যাক্স, র‍্যাফেল ওস্নুনার মত উদীয়মান খেলোয়াড়দের পরাজিত করে সহজেই লেভার ফাইনালে উঠলেন। অপর দিক থেকে ফাইনালে উঠলেন গতবারের আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান রয় এমার্সন।

বাজ প্রতিদিন বসে লেভারের খেলা দেখতেন। রাত্রে নিয়ে যেতেন

ডিনার খেতে, তারপর গান বাজনার আসরে। চতুর্মুকুটের কথা ভাবতে দিতেন না লেভারকে। মন হাল্কা থাকবে।

ফাইনালে আবার লেভার আর এমার্সন। এমার্সন একটু দ্বিধান্বিত —এই বছর তিনি তিন-তিনবার লেভারের কাছে পরাজিত হয়েছেন— এবার কি আর তিনি জয়লাভ করতে পারবেন? আমেরিকান চ্যাম্পিয়ানশিপের মুকুট হারাতে হবে কি?

লেভারের হাত সাধারণত দেরিতে খোলে। এমার্সন প্রথমেই তাঁর দুটি সার্ভিস গেম জিতলেন, কিন্তু এমার্সনের পরের সার্ভিস ভেঙে গেম নিলেন লেভার। এবার যদি লেভার নিজের সার্ভিস না হারান তো তাঁর জয় অনিবার্য। হলও তাই; প্রথম সেট ৬-২ গেমে নিলেন লেভার।

দ্বিতীয় সেটেও ঠিক আগেকার মত খেলা—সার্ভিস আর ভলি। এবারে এমার্সন একটু কঠিন প্রতিযোগিতা করলেন; কিন্তু এমার্সনের সার্ভিস গেম জিতে আর নিজের সার্ভিস ধরে রেখে লেভার দ্বিতীয় সেটটি ৬-৪ গেমে জিতলেন।

দুই সেটে অতি সহজেই জয়, আর মাত্র একটি সেট—একটি সেটে জয়লাভ করতে পারলেই লেভার চতুর্মুকুটধারী হবেন। দর্শকেরা এবার সমস্বরে এমার্সনকে বাহবা দিতে লাগল, কারণ ভাগ্য এখন তাঁর বিরুদ্ধে। দর্শকদের মুহুর্মুহু অভিনন্দনে এমার্সন মনের বল ফিরে পেলেন। পরাজয়ের মনোভাব তাঁর দূর হয়ে গেল। বাঘের মত তিনি লেভারের সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। তৃতীয় সেটে দু-জনেই সার্ভ আর ভলিতে সমান প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ এমার্সন লেভারের সার্ভিস গেম অধিকার করে নিলেন, কিন্তু সে সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে পারলেন না। পরের গেমেই এমার্সনের সার্ভিস ভেঙে দিয়ে গেম জিতলেন লেভার। দ্বাদশ গেমে লেভারের প্রচণ্ড ভলিকে প্রতিহত করে যে পাসিং শট এমার্সন মারলেন, তাতে বলটি নেটের ফিতেয় লেগে গড়িয়ে পড়ল লেভারের কোর্টে। লেভারের সার্ভিস গেমে এমার্সনের পয়েন্ট তখন ১৫-৪০। পরের সার্ভিসে ব্যাক-হ্যাণ্ড ক্রস-কোর্ট শটে সেই গেম এবং ৭-৫ গেমে সেটটি জিতলেন এমার্সন।

তখনও লেভার এগিয়ে আছেন ২-১ সেটে।

এবার দশ মিনিটের বিরতি।

লেভার মনে মনে স্থির করলেন যে যেমনভাবেই হোক এই সেটে খুব তাড়াতাড়ি এমার্সনের সার্ভিস ভেঙে গেম নিতে হবে। এই স্থির লক্ষ্য নিয়ে লেভার তৃতীয় সেট খেলতে নামলেন। এমার্সনের প্রথম সার্ভিস গেমই তিনি ছিনিয়ে নিলেন; কিন্তু পঞ্চম গেমে এমার্সন লেভারের সার্ভিস গেমে জয়লাভ করলেন। খেলার ফলাফল তখন লেভারের পক্ষে ৩-২। এর পরের গেমই লেভার দখল করলেন এমার্সনের সার্ভিস ভেঙে, ৪-২। এইভাবে ঘুরে ফিরে চলল খেলা। দু-জনেরই মনের ওপর, দেহের ওপর তখন তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। নবম গেম পর্যন্ত লেভার জিতছেন ৫-৩ গেমে।

হল ৫-৪। তারপর দশম গেম। এই গেমটি লেভার জিততে পারলেই তিনি চতুর্মুকুটধারী হবেন।

লেভারের তখন যেন আর কোন জ্ঞান নেই। র‍্যাকেটের হাণ্ডেলটাকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারছেন না, র‍্যাকেটটা কেমন যেন হাত থেকে পিছলিয়ে যাচ্ছে। মুখের তালু শুকিয়ে আসছে। র‍্যাকেট সমেত হাতটিকে যেন এক অদৃশ্য শক্তি টেনে রাখছে। পা-দুটো ভার হয়ে আসছে, পায়ের তলায় যেন আগুন জ্বলছে। ফরেস্ট হিলের সেণ্টার কোর্টের ওপরে দাঁড়িয়ে ঘেমে একসা হচ্ছেন লেভার।

এমার্সন শান্তভাবে খেলে ৩০-১৫ পয়েণ্টে এগিয়ে। লেভারের সার্ভিসকে সহজেই ফিরিয়ে দিলেন এমার্সন। সেই ফিরতি বলে বিদ্যুৎ-বেগে ভলি মেরে লেভার খেলাটিকে ৩০-৩০ পয়েণ্টে আনলেন। লেভারের এবারের সার্ভিসটা। ঠিক বুঝতে না পেরে এমার্সন তাড়াতাড়ি বলটাকে ফোর-হ্যাণ্ডে ব্লক করে ফেরত দিলেন। বলটি 'লব্' করে পড়ল লেভারের সামনে। সকলেই ধরে নিলেন যে এবার লেভার প্রচণ্ড স্ম্যাশ করবেন এবং এই মার আর ফেরত দেওয়া যাবে না। এমার্সন হতাশ হয়ে সরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু উত্তেজনার ঝোঁকে লেভার সেই বলটিকে ঠিকভাবে

মারতে পারলেন না, বলটি এসে পড়ল ঠিক তাঁরই পায়ের কাছে। সকলেই আশ্চর্য হয়ে লেভারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কী নিদারুণ মানসিক অবস্থা তখন লেভারের!

লেভার তাকালেন দর্শকদের মধ্যে বসে থাকা ডোনাল্ড বাজের দিকে। বাজ হাত তুলে খেলে যেতে ইসারা করলেন। বুক জুড়ে নিশ্বাস গ্রহণ করলেন লেভার, তারপর সার্ভ করার জন্য বেস-লাইনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর দেহে যেন কোন অস্থি নেই। যন্ত্রচালিতের মত ওপরের দিকে বল ছুঁড়ে দিলেন, বল নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে সজোরে র‍্যাকেট চালালেন। অভ্যাস-মতই সার্ভিস করলেন, চিরকালের তীব্র সার্ভিস। এমার্সন পর-পর দুটো লেভারের সার্ভিসে ভুল খেললেন, বল কোর্টের বাইরে চলে গেল। লেভারের অ্যাডভান্টেজ। এবার সর্বশক্তি দিয়ে সার্ভিস করলেন লেভার। এমার্সন বল ফেরত দিলেন, কিন্তু তার আগেই লেভার তীব্র গতিতে নেটের দিকে ছুটে গেছেন! এমার্সনের ফেরত-দেওয়া বলটিকে নেটের ওপর থেকেই ভলি করলেন। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে গিয়ে এমার্সন বলটি ফেরত দিলেন, কিন্তু বল বেস-লাইন পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল।

লেভার ১৯৬২ সনের আমেরিকান চ্যাম্পিয়ান হলেন। শুধু তাই নয়, টেনিসের ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় চতুর্মুকুটধারী বা গ্র্যাণ্ড স্ল্যাম উইনার।

নেটের কাছে গিয়ে এমার্সনের সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করার মত ক্ষমতাও ছিল না লেভারের। এত উত্তেজনার পর কেমন এক মানসিক অবসাদে তিনি ভেঙে পড়লেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে আম্পায়ারের কাছের চেয়ার থেকে কোনরকমে সোয়েটার তুলে নিয়ে পরলেন। এক নিরর্থক বিমর্ষতায় তাঁর মন ভরে উঠল। এত বড় গৌরবেও এতটুকু আনন্দের অনুভূতি তাঁর মন স্পর্শ করল না।

এমার্সন ছুটে এসে হ্যাণ্ড-শেক করে লেভারকে অভিনন্দন জানালেন। লেভারের চোখদুটো ছল-ছল করে উঠল। লেভারের এই গৌরবে এমার্সনের কী আনন্দ—নিজের পরাজয়ে কোনরকম দুঃখ বা ক্ষোভ নেই।

তাঁর চেয়ে তরুণ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এই চ্যাম্পিয়ানশিপ ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য লেভারই যেন বিষণ্ণ বোধ করতে লাগলেন।

কোর্ট থেকে বাইরে যাওয়ার দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ডোনাল্ড বাজ—প্রথম চতুর্মুকুটধারী। বাজ লেভারকে অভিনন্দন জানালেন।

এত বড় জয়-গৌরবের পরেও লেভারের নিজেকে কত ছোট মনে হল।*

* ১৯৬৯ সনে রড লেভার আবার চতুর্মুকুট বিজয়ী হয়েছেন। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কোন খেলোয়াড় এই সুদুর্লভ সম্মান অর্জন করতে পারেন নি।

জাদুকরের জাদু

১৯৬০ সনের ১৮ই মে-র সন্ধ্যা। স্কটল্যাণ্ডের গ্লাসগো শহরে এক নতুন উদ্দীপনা ছড়িয়ে ছিল। সে যেন এক উৎসবের দিন। স্কুল, কলেজ, অফিস—সব কিছুই সরকারীভাবে বন্ধ। সেজে-গুজে দলে-দলে লোক ছুটে চলেছে হ্যাম্পডেন পার্কের দিকে। সুদীর্ঘ লাইন লেগে গেছে টিকিটের কাউন্টারে।

ইউরোপিয়ান কাপ ফাইনালের খেলা।

না, গ্লাসগো কিংবা স্কটল্যাণ্ডের অন্য কোন টীম ফাইনালে ওঠে নি যে দেড় লক্ষ দর্শক ঘন্টার পর ঘন্টা খেলা শুরুর জন্য স্টেডিয়ামে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে। ফাইনালে বরং উঠেছে পশ্চিম জার্মানির চ্যাম্পিয়ান ক্লাব, গ্লাসগো রেঞ্জার্সকে প্রথম লেগে জার্মানিতে ৬-১ গোলে, এবং তারপর দ্বিতীয় লেগে এই হ্যাম্পডেন পার্কের মাঠে ৬-৩ গোলে পরাজিত করে স্কটিশ দর্শকদের বিস্ময়ে হতবাক্ করে দেয়। তাদের চ্যাম্পিয়ান ক্লাবের এই শোচনীয় পরাজয় তারা বিশ্বাসই করতে পারে নি।

ফুটবল-পাগল স্কটল্যাণ্ড। ক্রিকেট নয়, টেনিস নয়—তাদের জাতীয় খেলা ফুটবল। ফুটবল তাদের জীবন, ফুটবলই তাদের স্বপ্ন। স্কটল্যাণ্ডের ফুটবল-গৌরবকে যখন পশ্চিম জার্মানির আইনট্রাখট ক্লাব একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেল, তখন এই ক্লাবের ওপর তাদের প্রথমে এক বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু যখন ফাইনালটা তাদের হ্যাম্পডেন পার্ক মাঠে খেলা হবে স্থির হল, তখন আইনট্রাখট ক্লাবের প্রতি বিদ্বেষ সপ্রশংস সহানুভূতিতে পরিণত হল। ফাইনালে যখন গ্লাসগো রেঞ্জার্স-জয়ী আইনট্রাখট উঠেছে, তখন আইনট্রাখট ক্লাবই ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান হোক। তবু তাদের মনে এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে চ্যাম্পিয়ান ক্লাবের কাছেই তারা পরাজিত হয়েছিল।

আইনট্রাখট ক্লাবের সে কী খেলা! সেণ্টার-ফরোয়ার্ড এরভিন স্টেইনের অদ্ভুত ক্রীড়া-চাতুর্যের কাছে সেদিন গ্লাসগো রেঞ্জার্স নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল। সেমি-ফাইনালের সেই সম্পূর্ণ সুন্দর আইনট্রাখট ক্লাব আবার হ্যাম্পডেন পার্কে এসেছে তাদের সম্মোহনী ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাতে। আইনট্রাখট ক্লাবকেই স্কটিশ দর্শকেরা নিজেদের ক্লাব বলে মেনে নিয়ে খেলা দেখতে ভিড় করল।

কিন্তু ফাইনালে উন্নীত অপর টিমও কম যায় না। স্পেনের চ্যাম্পিয়ান ফুটবল ক্লাব আবার উঠেছে ফাইনালে। ১৯৫৫ সন থেকে এই প্রতি-যাগিতা শুরু। সেই বছরটিই শুধু বাদ দিয়ে আর প্রতি বছরই তারা ইউরোপিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ান হয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ক্লাব বলে স্বীকৃত হয়েছে। এইবার চ্যাম্পিয়ান হলে তারা পর-পর পাঁচ বছর ইউরোপিয়ান কাপ বিজয়ী হবে।

রিয়েল ম্যাড্রিডের একমাত্র ভরসা তাদের দুটি ফরোয়ার্ডের ওপরে। প্রথম হয়েছেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড আলফ্রেডো ডি স্টেফানো। জাতে আর্জেন্টিয়ান। -আর্জেন্টিনা ও কলাম্বিয়ার আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় প্রচুর যশ অর্জন করার পরে স্পেনে এসেছেন। এত বড় সুযোগ-সন্ধানী খেলোয়াড় পৃথিবীতে খুব কম দেখা যায়। ১৯৫২-৫৪ সনের পুস্কাসের নেতৃত্বে হাঙ্গারির জাতীয় ফুটবল দলের অনিন্দ্যসুন্দর খেলার জন্যই তাঁকে তখন পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গোলদাতা বলত। প্রথম অবশ্য ছিলেন পুস্কাস—হাঙ্গারির দুর্ধর্ষ লেফ্‌ট্‌ ইন।

আর রিয়েল ম্যাড্রিডের দ্বিতীয় ভরসা হয়েছেন ফুটবল-জগতের সেই আশ্চর্য জাদুকর ফেরেন্‌ক্‌ পুস্কাস। ফরোয়ার্ড লাইনে এত সুন্দর খেলোয়াড় বোধহয় আজ পর্যন্ত ফুটবলের মাঠ দেখে নি। যেমন সুন্দর বল কাটানোর ভঙ্গি, বলের ওপর আধিপত্য, সেইরকম নিখুঁত পাস এবং গোলার মত তীব্র শট। তাঁর যুগে একা পুস্কাসই বিপক্ষ দলের এগারটি খেলোয়াড়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিলেন। ১৯৫২-৫৩ সনে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এই ব্যাপার বার-বার প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু পুস্কাসের আজ বয়স হয়েছে। তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর যৌবনের সেই ক্রীড়াচাতুর্য,

দম বা ক্ষিপ্রগতি নেই। এখন অভিজ্ঞতাই শুধু সম্বল। তবু পুস্কাস পুস্কাস-ই।

সব জড়িয়ে কিন্তু আইনট্রাখট ক্লাবই বছরের সেরা ফুটবল টীম। তবু একটা মস্ত বড় 'কিন্তু' থেকে যায়। পড়ন্ত দিনের পুস্কাস এখনও খেলছেন রিয়েল ম্যাড্রিড ক্লাবে। বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে হবে কি—পুস্কাস তো পুস্কাসই।

খেলা আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগেই সমস্ত স্টেডিয়াম হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেল। উৎসাহী স্কটিশ দর্শকেরা প্রতীক্ষা করতে লাগল খেলা শুরু হওয়ার। প্রতিপক্ষ দলদুইটি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করল, রেফারির সঙ্গে করমর্দন করল। লাইন্‌স্‌ম্যান দু-জন তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

রেফারির বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই স্টেডিয়ামের ওপরে জমাট-বাঁধা মেঘ যেন একসঙ্গে হাজার বজ্র-গর্জনে ফেটে পড়ল। দর্শকেরা আনন্দে ও উত্তেজনায় এতক্ষণের নীরবতা ভেঙে চিৎকার করে উঠল। দেড় লক্ষ দর্শক সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল—বাক আপ আইনট্রাখট! আইনট্রাখট! স্টেইন! স্টেইন! ক্রেশ! ক্রেশ!

খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আইনট্রাখটের ক্ষিপ্রগতি তরুণ খেলোয়াড়েরা দর্শকদের উৎসাহে ঝড়ের গতিতে বল টেনে নিয়ে রিয়েল ম্যাড্রিডের গোল-অঞ্চলে হানা দিয়েছে। সেই প্রবল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে রিয়েল ম্যাড্রিড একেবার কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। আইনট্রাখটের ফরোয়ার্ড দলের এক-একটা তরঙ্গ এসে আছড়িয়ে পড়েছে রিয়েল ম্যাড্রিডের গোলের ওপর, আশ্চর্যভাবে পতন থেকে তারা রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে। এই চাপ আর কতক্ষণ সহ্য করতে পারবে রিয়েল ম্যাড্রিড?

প্রথম ধাক্কা সামলিয়ে নিল রিয়েল ম্যাড্রিড। তাদের রক্ষণভাগ অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিপক্ষের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করল। তারপর চলল সারা মাঠ জুড়ে ছুটোছুটি, দুই দলেরই আক্রমণাত্মক খেলা—কিন্তু কোন দলেরই রক্ষণভাগ নতি স্বীকার করল না। স্কটিশ দর্শকেরা

আইনট্রাখট ক্লাবের খেলোয়াড়দের বারবার বাহবা দিতে লাগল। রিয়েল ম্যাড্রিডকে উৎসাহ দেবার মত কেউ ছিল না স্টেডিয়ামে।

কিন্তু পনের মিনিট সময় কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ রিয়েল ম্যাড্রিডের পুস্কাস একটি বল নিয়ে সুন্দর থ্রু পাস করে দিলেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি স্টেফানোকে। ডি স্টেফানো বলটা সঙ্গে সঙ্গে লেফট আউট জেণ্টোকে ঠেলে দিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলেন গোল লক্ষ্য করে। জেণ্টো বলটি নিয়ে লাইন ধরে লম্বা দৌড় দিলেন। একেবারে কোনা থেকে কর্নার কিকের মত উঁচু সেণ্টার করলেন। এই শটের জন্য তৈরিই ছিলেন ডি স্টেফানো। চকিতে তিনি লাফিয়ে উঠে হেড করলেন, কিন্তু বলটি ক্রস-বারে লেগে ফিরে এল। মরিয়া হয়ে আইনট্রাখটের ব্যাক সেই বল মেরে মাঝ-মাঠে পাঠিয়ে দিলেন। আইনট্রাখটের সেণ্টার ফরোয়ার্ড স্টেইন পেলেন সেই বলটি। বিদ্যুৎগতিতে তিনি বলটি নিয়ে ডান দিকের লাইনের দিকে ছুটে চললেন। রাইট আউট ক্রেশ যেন খেলার ধারা বুঝতে পেরে নিজের জায়গা ছেড়ে সেণ্টারের দিকে ছুটতে লাগলেন। হঠাৎ বলটি থামিয়ে ফেললেন স্টেইন। পশ্চাদনুসরণরত রিয়েল ম্যাড্রিডের দু-জন হাফব্যাক এক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে স্টেইন বলটি নিচু শটে এগিয়ে দিলেন ক্রেশের দিকে। ক্রেশ এই পাসেরই অপেক্ষা করছিলেন, চলন্ত বলেই এক তীব্র শটে আইনট্রাখটের পক্ষে প্রথম গোল করলেন (১-০)।

স্কটিশ দর্শকেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। ঠিক এই ধরনের ফুটবল খেলা দেখতেই তারা চায়—তীব্র গতি, নিখুঁত পাস এবং গোল—ধাক্কাধাক্কি নেই, জড়াজড়ি নেই—শিল্পীর তুলির টানে একটা সুন্দর ছবি।

প্রথমটা দমে গেল রিয়েল ম্যাড্রিড। সেমি-ফাইনাল খেলার ছুটি লগেই আইনট্রাখটের গোল করবার ক্ষমতা দেখে প্রথম থেকেই তারা শঙ্কিত ছিল, এবারে আবার বোধহয় শুরু হল সেই গোল দেওয়ার খেলা। আইনট্রাখটের ফরোয়ার্ডেরা আবার রিয়েল ম্যাড্রিডের গোলে বোমা বর্ষণ করতে লাগল।

কিন্তু মাত্র আট মিনিট। আট মিনিট পরেই খেলার সমস্ত ধারা

পরিবর্তিত হয়ে গেল। অন্ধকার কোণ থেকে রিয়েল মাড্রিড বেরিয়ে এল উজ্জ্বল আলোকে। সমস্ত মাঠ ভাস্বর হয়ে উঠল একটি খেলোয়াড়ের প্রতিভার দ্যুতিতে। স্কটিশ দর্শকেরা ফুটবল খেলার জাদুকরের পড়ন্ত বেলার এক নতুন কীর্তিতে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পুস্কাস নিজেদের গোল লাইন থেকে একটা বল নিয়ে ড্রিব্‌ল্ করতে করতে এগিয়ে গেলেন। একটির পর একটি আইনট্রাখটের খেলোয়াড়কে নাচিয়ে কাটিয়ে বলটি আস্তে ঠেলে দিলেন লেফট-আউট জেণ্টোকে। সঙ্গে সঙ্গে জেণ্টো সেই বলটি আইনট্রাখটের গোলের কাছাকাছি ডি স্টেফানোর কাছে ফেলে দিলেন। ডি স্টেফানোর বুলেটের মত শট গোলকিপার ধরবার সুযোগ পেলেন না (১-১)।

সেণ্টার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুস্কাস আবার বলটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিলেন এবং আইনট্রাখটের তিন-চারজন খেলোয়াড়কে তাঁর পায়ে পায়ে রেখে ড্রিব্‌ল্ করে অগ্রসর হতে লাগলেন। পুস্কাসকে তাঁরা কিছুতেই প্রতিহত করতে পারছিলেন না, উপরন্তু তাঁদেরই পুস্কাস প্রায় সম্মোহিত করে রেখেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলটিকে মাঠের ফাঁকা জায়গায় ঠেলে দিলেন। বল পেলেন ডি স্টেফানো। মাঠ প্রায় ফাঁকা, পুস্কাসই রক্ষণ-ভাগের তিনটি খেলোয়াড়কে নিজের কাছে ধরে রেখেছেন। সোজা ছুটে গিয়ে ডি স্টেফানো এক তীব্র শটে দলের দ্বিতীয় গোল করলেন (২-১)। পরাজয়ের মুখ থেকে জয়ের দিকে অগ্রসর হল রিয়েল ম্যাড্রিড।

এই অনুপ্রেরণাই প্রয়োজন ছিল রিয়েল ম্যাড্রিডের। সমস্ত টীমকে অনুপ্রাণিত করে তুলল পুস্কাস এবং ডি স্টেফানোর খেলা। পুস্কাসই রিয়েল ম্যাড্রিডের জয়লাভের আশা তাঁর অসামান্য প্রতিভায় সহজ করে দিয়েছেন। এবার রিয়েল ম্যাড্রিড যে খেলা শুরু করল তা স্কটিশ দর্শকেরা কোনদিন দেখে নি। আইনট্রাখট ক্লাবের খেলোয়াড়রাও এ ধরনের আশ্চর্য খেলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সমস্ত সময় শুধু রিয়েল ম্যাড্রিড দলের খেলোয়াড়দের পায়েই বল, সারা মাঠ জুড়ে যেন একটি ফুটবল দল—রিয়েল ম্যাড্রিড। তাদের প্রতিটি খেলোয়াড় যেন এক-এক জন আশ্চর্য নিপুণ শিল্পী, পায়ে এবং বলে প্রতি মুহূর্তে এক একটি অবিস্মরণীয়

চিত্র এঁকে চলেছেন। আর আইনট্রাখট ক্লাবের খেলোয়াড়েরা শুধু রিয়েল ম্যাড্রিডের খেলোয়াড়দের ছায়া অনুসরণ করে ফিরছে।

এখন আর রিয়েল ম্যাড্রিডের গোল স্কোর করার তাড়া নেই, ইচ্ছামত গোল করলেই চলবে—এখন তোমরা সকলে প্রদর্শনী খেলা দেখে যাও।

হাফ টাইমের ঠিক আগে ডি স্টেফানো রাইট-ইন লুইস ডেল সোলকে একটি বল ঠেলে দিলেন। ডেল সোল বল নিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাস করলেন পুস্কাসকে। গোল করতে এতটুকু ভুল করলেন না পুস্কাস (৩-১)।

হাফ-টাইমে রিয়েল ম্যাড্রিড ৩-১ গোলে এগিয়ে রইল।

দ্বিতীয় হাফের শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই পুস্কাস বল নিয়ে একা এগিয়ে চললেন। বিপক্ষ দল কিছু বুঝতে পারার আগেই তিনি বল নিয়ে একেবারে পেনাল্টি সীমানার ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। বেগতিক দেখে গোলকিপার ছুটে এসে তাঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ; কিন্তু পুস্কাস ডান দিকে একটু সরে গিয়ে ফাঁকা গোলে বল মারলেন (৪-১)।

এবারে স্কটিশ দর্শকেরা সহর্ষ অভিনন্দন জানাল এই ফুটবল-জাদুকরকে। বয়সের ভার তাঁর প্রতিভাকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি। এবারে দর্শকেরা শুধুই চিৎকার করে চলেছেন—বাক আপ রিয়েল ম্যাড্রিড! বাক আপ পুস্কাস!

দু-মিনিট পরেই পুস্কাস আবার বল নিয়ে তীব্র বেগে আইনট্রাখটের রক্ষণভাগ ভেদ করে ছুটে চললেন। নিরুপায় হয়ে আইনট্রাখটের রাইট ব্যাক পেনাল্টি সীমানার মধ্যে পুস্কাসকে ফাউল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দিলেন। বল সাজিয়ে পুস্কাস ডি স্টেফানোকে বল মারতে বললেন ; কিন্তু ডি স্টেফানো পুস্কাসকে হ্যাটট্রিকের গৌরব থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন না। পেনাল্টি থেকে পুস্কাস দলের পঞ্চম গোল করলেন (৫-১)। ইউরোপিয়ান কাপ ফাইনালে এই প্রথম হ্যাটট্রিক।

পাঁচটি গোল দেওয়ার পর রিয়েল ম্যাড্রিডের খেলায় আর পূর্বেকার

প্রাণ রইল না। জয়লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট গোলের ব্যবধান আছে। খেলার ফলাফল স্থির হয়েই গেছে, এবারে রেফারির বাঁশি বাজলেই হয়। যতটুকু সময় বাকি আছে ততটুকু সময় আবার তারা প্রদর্শনী খেলার মত খেলে যেতে লাগল।

খেলা শেষ হতে আর তখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। জেন্টো বল নিয়ে বিপক্ষ দলের একটির পর একটি খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোলের সামনে বল ফেললেন। বাঘের মত বলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন পুস্কাস। আর এক গোল (৬-১)।

শেষ মুহূর্তের নাটক শুরু হল। পরের মিনিটেই আইনট্রাখটের সেণ্টার ফরোয়ার্ড স্টেইন রাইট-আউট ক্রেশের কাছ থেকে বল পেয়েই চকিতের মধ্যে এক তীব্র শটে একটি গোল শোধ করলেন। (৬-২)। সেণ্টারের সঙ্গে সঙ্গে পুস্কাস আর ডি স্টেফানো বল নিয়ে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে করতে উপস্থিত হলেন বিপক্ষ দলের গোলের সামনে। ডি স্টেফানো সহজেই দলের সপ্তম গোল করলেন (৭-২)। দর্শকদের উল্লাস থামতে না থামতেই আইনট্রাখটের স্টেইন আবার বল নিয়ে একটি চমৎকার গোল করলেন (৭-৩)।

তিন মিনিটের মধ্যে চারটি ছবির মত গোল! কয়জনের সৌভাগ্য হয় এই ধরনের খেলা দেখা? অস্তগামী ফুটবল-প্রতিভার শেষ বড় খেলায় চারটি আশ্চর্য-সুন্দর গোল। একটা হ্যাটট্রিক! দলের আর তিনটি গোলেরও তিনিই পথিকৃৎ।

রিয়েল ম্যাড্রিড পর-পর পাঁচ বার ইউরোপিয়ান কাপ বিজয়ী। হল। স্বীকৃত হল ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল ক্লাব হিসেবে।

আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টার ক্লাবের ম্যানেজার খেলার শেষে বলেছিলেন, —মাত্র সাত গোল! পুস্কাস আর ডি স্টেফানো ইচ্ছা করলে সতের গোলও দিতে পারতেন।

দলের খে
দল—রিয়েল
আশ্চর্য নি

জয়গৌরবের ট্র্যাজেডি

টেনিসের যে রকম উইম্বলডন, ঘোড়দৌড়ের সেই রকম এপ্‌সম। এপ্‌সমের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ডার্বি-দৌড়। এই ডার্বি-দৌড়ে যে ঘোড়া প্রথম হতে পারেনি, যে জকি ডার্বি জিততে পারেনি—ঘোড়-দৌড়ের ইতিহাসে তারা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করে না। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জকি পৃথিবীর সবকটি বড় ঘোড়দৌড় সবচেয়ে বেশিবার জিতেও জকি-জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ১৯৫৩ সনে শেষ পর্যন্ত ডার্বি-দৌড়ে জয়লাভ করেছিলেন। তার আগেকার আঠার বছর গেছে এই জয়লাভের দুর্বার চেষ্টায় এবং চরম ব্যর্থতার। ডার্বি-জয়ের পরে তিনি আর বেশিদিন জকি থাকেন নি, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জন করে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ডার্বি-দৌড়ে সাফল্য জকি-জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সেইজন্যই বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া আর শ্রেষ্ঠ জকি প্রতি বছরই আসে এপ্‌সমে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য। কিন্তু শুধু ভাল ঘোড়া এবং ভাল জকিই এই দৌড়ে জয়লাভে সাহায্য করে না, সঙ্গে চাই ভাগ্যদেবীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ। তার কারণ এই যে, এপ্‌সমের মাঠ ঠিক সাধারণ ঘোড়-দৌড়ের মাঠের মত নয়। সমতল মাঠ হঠাৎ বেশ ঢালু (এপ্‌সম ডাউনস্‌) হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে ট্যাটেনহাম কর্নার পর্যন্ত। এখানেই আবার ঘোড়-দৌড়ের বেড়া বাঁক ফিরে হঠাৎ সোজা হয়ে গিয়েছে। ঢালু জায়গা দিয়ে দুরন্ত-জোরে-ছুটে-আসা ঘোড়া সব সময়ে টাল সামলাতে পারে না, জকিকে নিয়ে পড়ে যায়। যে-কটি ঘোড়া এই ধাক্কা সামলাতে পারে, তাদের মধ্যে আবার কিছু ট্যাটেনহ্যাম কর্নারে সজোরে বাঁক নিতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে কিংবা অন্ত পথে চলে যায়। তা ছাড়া প্রত্যেক জকিই রেলিং ঘেঁসে ঘোড়াকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে চান, কারণ তাহলে ঘোড়াকে শুধু যে কম পথ দৌড়তে

হয়, তা-ই নয়—রেলিং-এর পাশ থেকে অন্য কোন ঘোড়ার চ্যালেঞ্জও আসতে পারে না। কিন্তু ট্যাটেমহ্যাম কর্নারে বাঁক নেবার সময়ে অনেক জকিই ঘোড়াকে রেলিং-এর কাছে রাখতে পারেন না, পিছন থেকে যে-কোন ঘোড়া ছুটে এসে রেলিং-এর ধার ধরে নিতে পারে।

এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের শ্রেষ্ঠ জকি স্টীভ ডোনখেরও স্যর গর্ডন রিচার্ডসের মত এই ডার্বি-সাফল্য বার-বার হাতের মুঠোর মধ্যে এসেও বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, আমেরিকা, আয়ার্ল্যাণ্ড—ঘোড়দৌড়ের প্রতিটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশে প্রতিটি বড়-বড় দৌড়ে একাধিকবার জয়ের মুকুট ধারণ করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই ডার্বি-দৌড় তাঁর মুষ্টি-চ্যুত হয়েছে। হতাশায় তার মন ভেঙে গিয়েছিল। বয়স হয়ে যাচ্ছে, অবসর গ্রহণের সময় ঘনিয়ে আসছে। জকি-জীবনে দুর্ঘটনা যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে—তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর এই ধারণাই হয়েছিল যে হয়ত আর জীবনে ডার্বি জয়লাভ করতে পারবেন না।

স্টীভ ডোনঘ তখন ট্রেনার চার্লস মর্টনের ঘোড়ার জকি। চার্লস তার ভাল ভাল ঘোড়া দিয়েছে স্টীভকে ডার্বি-দৌড়ের জন্য। অন্যান্য বড় দৌড়ে তারা প্রথম হয়েছে, কিন্তু ডার্বি-দৌড়ের জন্য যে সাহস, উদ্যম, বিচক্ষণতা, দম, মনোবল, শক্তি এবং ক্ষিপ্র গতি প্রয়োজন—সব কয়টি গুণ একত্রে তাদের মধ্যে ছিল না।

এই সময়ে চার্লস একটি নতুন ঘোড়া আনলেন। পিঠে জিন চাপানো-মাত্র সে এমন লাফালাফি করতে লাগল যে চার্লসের অন্তরালে সকলেই হেসে খুন। চার্লস এই ঘোড়ার নাম রাখলেন—হিউমারিস্ট।

এই ঘোড়াটিকে চার্লস সযত্নে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই চার্লস বুঝতে পারলেন যে হিউমারিস্ট একটি জাত-ঘোড়া, যে রকম বুদ্ধিমান সেইরকম ক্ষিপ্রগতি।

হিউমারিস্টের বয়স যখন দু-বছর, তখন চার্লস স্টীভকে হিউমারিস্টের ওপর চড়তে দেন। গ্যালাপ করে ছুটে এসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্টীভ চার্লসকে বললেন—তুমি একটা রাজা-ঘোড়া এনেছ! হিউমারিস্ট এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ঘোড়া হয়ে দাঁড়াবে!

চার্লস মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—ডার্বি জিততে পারবে কি ?

উত্তর না দিয়ে স্টীভ হিউমারিস্টকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন—কিরে, পারবি জিততে ?

হিউমারিস্ট কি বুঝল কে জানে, লম্বা ঘাড় দুলিয়ে সে তার সম্মতি জানাল।

১৯২১ সন।

ডার্বিতে জয়লাভ করতে হলে প্রথমে ছোটখাটো দৌড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তাই হিউমারিস্টকে নিয়ে স্টীভ ইংল্যাণ্ডের, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন। প্রথম-প্রথম হিউমারিস্ট অপরিচিত ঘোড়া বা লোকজন দেখে দৌড়তে চাইত না, কিন্তু নিজেকে একটু সামলিয়ে নেওয়ার পর আর কোনও প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় তো হয়ই নি, বরং তার এবং দ্বিতীয় ঘোড়ার মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান থাকত দশ বারো লেংথ।

সকলেরই নজর পড়ল এই নতুন ঘোড়া হিউমারিস্টের ওপর। কে তার জকি ?—বিশ্বচ্যাম্পিয়ান স্টীভ ডোনঘ।

ডার্বি-দৌড়ের জন্য এবার প্রস্তুত হল হিউমারিস্ট। অল্প দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ভাল-ভাল ঘোড়ার মধ্যেও সে অদ্বিতীয়, কিন্তু দীর্ঘ দূরত্বের পাল্লায় বাছাই ঘোড়া আর বাছাই জকির কাছে ?—সে পরীক্ষা তখনও হয় নি।

ডার্বি দৌড়ের ঠিক আগেই হয় দু-হাজার গিনি দৌড়ের প্রতিযোগিতা। ডার্বি দৌড়ের সমস্ত প্রতিযোগী ঘোড়াই নিজেদের ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। চার্লস হিউমারিস্টের নাম দু-হাজার গিনি প্রতিযোগিতায় পাঠালেন।

বাজি ধরার বাজারে সবচেয়ে দাম হল হিউমারিস্টের। ঘোড়-দৌড়ের বই পড়ে সকলে জানতে পেরেছেন যে তাকে পরাজিত করার মত দ্বিতীয় ঘোড়া আর সে বছরে নেই। হিউমারিস্টের ওপর সকলে প্রচুর টাকার বাজি ধরলেন।

বড় দৌড়ের জন্য শিক্ষা দিতে গিয়ে চার্লস্ আর স্টীভ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। হিউমারিস্টের স্বভাব একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাকে আর যেন চেনা যায় না। এক নিষ্প্রাণ, নির্জীব, বিষণ্ণ ঘোড়া— থেকে-থেকেই হাঁ করে ঘন-ঘন দম নেয়। স্টীভের শত চেষ্টাতেও সে আর গ্যালাপ করে না।

ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার দেখলেন, কিন্তু কোন অসুখ ধরতে পারলেন না। স্বাস্থ্য বেশ ভালই।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্টীভ চার্লসকে বললেন—এবারেও আর ডার্বি জেতা হল না।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই হিউমারিস্ট আবার আগেকার মতই সতেজ, চঞ্চল হয়ে উঠল। দৌড়ের সময় তার দুর্বার গতি ঠেকিয়ে রাখা দায়। চার্লস এবং স্টীভ দু-জনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু সে মাত্র কয়েক দিন। আবার হিউমারিস্ট বাতিল ঘোড়ার মত আচরণ করতে লাগল।

চার্লস আশ্বাস দিলেন—ঘাবড়িও না স্টীভ। রেসের দিন অন্য সব ঘোড়া দেখে নিশ্চয়ই ওর মেজাজ ফিরে আসবে। দু-হাজার গিনি আমরা জিতবই।

দু-হাজার গিনির দৌড়।

শুরুর সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রেষ্ঠ ঘোড়ার মত হিউমারিস্ট আর সব ঘোড়াকে পিছনে ফেলে স্টীভের নির্দেশ মত বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে চলল। হাজার হাজার দর্শকের মনে চরম উত্তেজনা, মুখে সহর্ষ চিৎকার—হিউমারিস্ট! হিউমারিস্ট!

আর মাত্র পঞ্চাশ গজ। দ্বিতীয় ঘোড়া ক্রেগ আন এরান তখনও দশ গজ পিছনে। দু-হাজার গিনি হিউমারিস্টের কুক্ষিগত!

কিন্তু ঠিক সেই চরম মুহূর্তে হিউমারিস্ট নিজে থেকেই তার গতি থামিয়ে দিয়ে প্রায় একরকম দাঁড়িয়ে পড়ল। দর্শকদের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, আক্ষেপ, বিস্ময় এবং জকি স্টীভের করুণ কাকুতি-মিনতিতে সে কান দিল না। মুখ হাঁ করে সে দম নিতে লাগল।

এক মুহূর্ত।

তারই মধ্যে ক্রেগ আন এরান, লেমোনারা এবং আরো তিনটে ঘোড়া তাকে অতিক্রম করে গেল।

স্টীভ কান্নায় ভেঙে পড়ে চিৎকার করতে লাগলেন—হিউমারিস্ট, প্লীজ! হিউমারিস্ট! হিউমারিস্ট!

প্রভুর ডাকে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল হিউমারিস্ট। তার সামনের পাঁচটি ঘোড়া তখন প্রথম হওয়ার জন্য লড়াই করছে। সকলের আগে ক্রেগ আন এরান, হিউমারিস্টের থেকে কুড়ি গজ এগিয়ে।

হঠাৎ কী যেন হল! হিউমারিস্টের খুরে যেন আবার আগুন জ্বলে উঠল! একটির পর একটি ঘোড়াকে পরাজিত করে এসে সে প্রায় ধরে ফেলল প্রথম দুটি ঘোড়াকে।

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। প্রথম হল ক্রেগ আন এরান, দ্বিতীয় হল লেমোনারা আর তৃতীয় হিউমারিস্ট। প্রায় ডেড-হিট—এক চুলের জন্য হিউমারিস্ট তৃতীয় হয়ে গেল। সকলেই স্বীকার করলেন যে আর একটু সময় পেলে হিউমারিস্ট প্রথম হতে পারত, আর হঠাৎ থেমে না পড়লে তার ধারে-কাছে কোন ঘোড়া ঘেঁসতে পারত না।

দু-হাজার গিনি দৌড়ের আগে হিউমারিস্ট ছিল ডার্বি-দৌড়ের সবচেয়ে ফেভারিট, কিন্তু এই দৌড়ের পর তার সম্বন্ধে সকলের ধারণা পরিবর্তিত হল। সকলেই স্বীকার করলেন যে অল্প দূরত্বের পাল্লায় হিউমারিস্ট অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু বড় দৌড়ে তার কোন আশা নেই। বাজির বাজারে হিউমারিস্টের দর কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় এসে থামল।

হাল ছাড়লেন না চার্লস আর স্টীভ। আর কয়েকদিন পরেই ডার্বি-দৌড়, হিউমারিস্টকে তৈরি করতে হবে। কিন্তু ঘোড়াটা আবার যেন কেমন হয়ে গেছে—দৌড়োতে চায় না, খেতে চায় না। ডাক্তারের চিকিৎসাতেও কোন ফল হল না।

চার্লস বললেন—হিউমারিস্টের নাম এ বছরের ডার্বি থেকে কাটিয়ে দিই।

আপত্তি জানালেন স্টীভ। তাঁর কেমন যেন দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে

এই হিউমারিস্টই তাঁকে ডার্বির প্রথম জয়-মুকুট পরিয়ে দেবে। ষ্টীভের সঙ্গে হিউমারিস্টের কেমন যেন এক আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দু-জনেই যেন দু-জনের মনের কথা বুঝতে পারতেন।

দিন যায়। ডার্বি-দৌড়ের দিন এগিয়ে আসে। হিউমারিস্ট দিন-দিন নির্জীব ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে।

১লা জুন, ১৯২১। ডার্বি-দৌড়ের দিন।

হিউমারিস্টকে বাইরে নিয়ে এলেন ষ্টীভ, একবার গ্যালাপ করে ঘুরে এলেন।

চার্লস জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন বুঝছ?

মাথা নাড়লেন ষ্টীভ, বললেন—কি যেন হয়েছে! দৌড়নোর মেজাজই নেই একেবারে।

চার্লস বললেন—ঘোড়ার বদনাম করিয়ে লাভ কী? এ বছর বাদ যাক!

ষ্টীভ বললেন—হয়ত বাদ দিতে হবে, কিন্তু আমাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে দাও।

ঘোড়দৌড়ের সময় যতই এগিয়ে আসছে ততই ষ্টীভের চোখ ছলছল করে উঠতে লাগল। হিউমারিস্টের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না! হিউমারিস্টের গলা জড়িয়ে ধরে ষ্টীভ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

নিজেকে একটু সংযত করে হিউমারিস্টের গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে ষ্টীভ বললেন—ঠিক আছে, হিউমারিস্ট। পরের বছর দেখা যাবে।

তাকিয়ে দেখলেন, হিউমারিস্টেরও চোখে জল।

কিন্তু কোন উপায় নেই। চার্লসকে বলে হিউমারিস্টের নাম দৌড় থেকে কাটানো দরকার। বাড়ির দিকে ফিরে চললেন তিনি।

হঠাৎ আস্তাবল থেকে এক অদ্ভুত চিৎকার শোনা গেল। ষ্টীভ ছুটে গেলেন। হিউমারিস্ট চিৎকার করছে, লাফালাফি করছে—যেন ষ্টীভকে সে ফিরিয়ে আনতে চায়। ষ্টীভকে দেখেই হিউমারিস্ট এগিয়ে এসে ষ্টীভের সর্বদেহে তার মুখ ঘসতে থাকে।

স্ট্রীত বুঝলেন হিউমারিস্টের মনের কথা। তার পিঠে জিন চাপিয়ে উঠে বসলেন।

এপ্সমের মাঠ লোকে লোকারণ্য। দৌড় শুরু হওয়ার প্রাথমিক উত্তেজনা সারা মাঠে ছড়িয়ে। উপস্থিত সকলের মুখে একই আলোচনা—কে জিতবে? দু-হাজার গিনি দৌড়-বিজয়ী লর্ড এস্টরের ক্রেগ আন এরান সম্বন্ধে সকলে একরকম নিশ্চিন্ত। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে লেটন, এলান ব্রেক কিংবা লর্ড ডার্বির গ্লোরিওসোর মধ্যেও যে-কেউ প্রথম হতে পারে। হিউমারিস্ট সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই, কেউ উৎসাহী নন,—তার অসুস্থতার সংবাদ সকলেরই জানা।

দৌড়ের জন্য সার দিয়ে প্রতিযোগী ঘোড়াগুলো দাঁড়াল। স্টার্টের সঙ্গে-সঙ্গেই এলান ব্রেক বিদ্যুতের মত দল ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তার পিছন-পিছন ছুটতে লাগল বোহেমিয়ান আর লেটন।

একটু পিছিয়ে একঝাঁক ঘোড়ার মাঝে হিউমারিস্ট, লেমোনারা, গ্লোরিওসো, ক্রেগ আর এরান। আর একটু পিছিয়ে আর এক ঝাঁকে বাদবাকি ঘোড়া।

আধ মাইলের পোস্টে আসার পর দৌড়ে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অগ্রবর্তী দলের ঘোড়াগুলোর মধ্যে মরণ-পণ সংগ্রাম চলেছে। এলান ব্রেক তখনও এগিয়ে, তার পরে লেটন, লেমোনারা, রোমান ফিডল, ক্রেগ আন এরান এবং হিউমারিস্ট। আধ মাইলে হিউমারিস্ট ষষ্ঠ।

এবারে সকলের দৃষ্টি ট্যাটেনহ্যাম কর্নারের ওপর। এই মোড়ের মাথায় কত ভাল ভাল ঘোড়ার সমাধি হয়েছে।

ট্যাটেনহ্যাম কর্নারের মোড় ঘুরতেই দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা দশ গুণ বেড়ে গেল। সকলেই সমস্বরে চিৎকার করছে—এলান ব্রেক! এলান ব্রেক!

এলান ব্রেক তখনও এগিয়ে, কিন্তু লেটন তার আর এলান ব্রেকের মধ্যে দূরত্ব অনেক কমিয়ে এনেছে। হিউমারিস্ট রেলিং ধরে নিয়েছে। ক্রেগ আন এরানও বিজয়ী হওয়ার জন্য তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আর সিকি মাইল।

দর্শকদের মধ্যে চিৎকার—এলান ব্রেক। এলান ব্রেক।

অপর দলের চিৎকার—ক্রেগ আন এরান। ক্রেগ আন এরান।

কিন্তু এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী যেন উলটিয়ে পালটিয়ে গেল। দৌড়ের সমস্ত পরিস্থিতিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। দৌড়ের ঝোঁকে এলান ব্রেক রেলিং থেকে একটু সরে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে স্টীভ চিৎকার করে উঠলেন—হিউমারিস্ট, দৌড়োও।

এক মুহূর্ত। একটা লাল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল এপ্‌সমের সবুজ মাঠের রেলিং-এর ধারে। রোমান ফিডল, লেমোনারা, ক্রেগ আন এরান, লেটনকে চোখের পলকে পার হয়ে রেলিং ধরে এলান ব্রেককে কাটিয়ে হিউমারিস্ট ছুটে চলল।

বিস্ময়-বিমূঢ় দর্শক এই আশ্চর্য ব্যাপারে চিৎকার করতে পর্যন্ত ভুলে গেল। একটা বাতিল ঘোড়া তাদের সকলের কল্পনা, স্বপ্ন একেবারে চুর্ণ করে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্টেডিয়াম থেকে তখন শুধু একটা গলা শোনা যেতে লাগল—বাক আপ, হিউমারিস্ট। হিউমারিস্ট।

চার্লসের গলা।

কিন্তু তখনও দৌড় শেষ হয় নি। ঠিক দু-হাজার গিনির দৌড়ের মত ক্রেগ আন এরান আবার হিউমারিস্টের ডান দিক দিয়ে তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। আবার দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা, চিৎকার—ক্রেগ আন এরান। ক্রেগ আন এরান।

হিউমারিস্ট আবার তার গতি বাড়াল। একটা লাল ঝড় বয়ে গেল শেষ দুশো গজের মধ্য দিয়ে। সেই ঝড়ের দুর্বার গতির কাছে পিছিয়ে গেল ক্রেগ আন এরান।

ডার্বি-দৌড়ে প্রথম হল হিউমারিস্ট। দ্বিতীয় ক্রেগ আন এরান, তৃতীয় এলান ব্রেক।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন স্টীভ। হিউমারিস্ট তাঁর কথা রেখেছে, তাঁকে তাঁর জীবনের প্রথম ডার্বি-মুকুট এনে দিয়েছে। ডার্বি কাপ হিউমারিস্টের পিঠে চাপিয়ে চার্লস বাড়ি ফিরলেন।

মনের আনন্দে চার্লস আর ষ্টীভ ছুটলেন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী মানিংসকে আনতে—হিউমারিস্টের একটা তৈল-চিত্র আঁকতে হবে।

পরদিন সকালে সদলে ফিরে এসে দেখলেন, হিউমারিস্ট আস্তাবলে শুয়ে আছে।

ডাক্তার দেখে বললেন—মারা গেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! এর শুধু একটা ফুসফুস আছে, দৌড়ানোর জন্য কী করে এত দম পেত?

ষ্টীভের চোখে ভেসে উঠল দু-হাজার গিনির দৌড়ের কথা—দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ থেমে গিয়ে হিউমারিস্টের হাঁ করে দম নেওয়া। দম নিতে অসুবিধে হত বলেই সে মাঝে-মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ত। সেইজন্যই সে ডার্বি দৌড়ে ছুটতে চায় নি, কিন্তু প্রভুর চোখে জল দেখে নিজের জীবন দিয়ে হিউমারিস্ট তার প্রভুর জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিয়ে গেল।

পালা-বদল

সত্যিই, কি বিচিত্র এই ক্রিকেট খেলা!

ক্রিকেট জগতের পণ্ডিতরা পর্যন্ত ছলনাময় ক্রিকেটের মতিগতি সব সময়ে বুঝে উঠতে পারেন না। ক্রিকেটের আকর্ষণ বোধহয় তার সেই বিভ্রান্তিকর রহস্যে, মাধুর্যও তার ফলাফলের অনিশ্চয়তায়।

নয় তো কে বলতে পারত যে ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ-রকম এক নাটকীয় বিপর্যয় হওয়া সম্ভব এবং সেই বিপর্যয়ের পর আবার অনুরূপ পুনরুজ্জীবন? ক্রিকেট খেলার রেকর্ড খুঁজে এর জুড়ির আর নজির পাওয়া যায় না।

হ্যাম্পশায়ারের সঙ্গে ওয়ারউইকশায়ারের ক্রিকেট খেলার কথা মনে পড়ে।

১৯২২ সনের ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই জুন—এই তিন দিনের কথা হ্যাম্পশায়ার বোধহয় কোনদিন ভুলতে পারবে না। কী নিদারুণ লজ্জা এবং অপমানে শেষ হয়েছিল ১৪ই জুনের খেলা—কোন খেলোয়াড়ই মাটির ওপর থেকে মুখ তুলতে পারেন নি, কোন খেলোয়াড়ই অপরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন নি।

সেই রাতে ডিনারের সময় ওয়ারউইকশায়ারের ক্যাপ্টেন ফ্রেডি গাফ-ক্যালথোর্প তাঁর পরম সুহৃদ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হ্যাম্পশায়ারের ক্যাপ্টেন লর্ড টেনিসনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—লজ্জা পাওয়ার কি আছে, ইয়োর লর্ডশিপ? মনে করুন না—এ এক গৌরবের এবং গর্বের কথা। এক ইনিংসে পনের রান—এ যুগের একটি রেকর্ড! ভগবানকে ধন্যবাদ দিন যে আরও কম রান হয় নি।

পরিহাসের ছলেই বলেছিলেন গাফ-ক্যালথোর্প, পরিহাস-ছলেই সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন লর্ড টেনিসন। উপস্থিত সকলে উপভোগ

করেছিলেন দুই ক্যাপ্টেনের এই রহস্যালাপ ; কিন্তু মরমে মরে গিয়েছিলেন হ্যাম্পশায়ারের দুই প্রবীণ পেশাদারী ব্যাট্স্‌ম্যান—ফিলিপ মীড এবং জর্জ ব্রাউন।

এক ইনিংসে মাত্র পনের রান! হাওয়েলের একটা বল যদি বাই-বাউণ্ডারি না হয়ে যেত তবে হত মাত্র এগার রান। মাত্র ন-টি ওভার, তার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল হ্যাম্পশায়ারের প্রথম ইনিংস।

অথচ ক্রিকেট টীম হিসেবে হ্যাম্পশায়ার সে সময়ে একেবারে ফেলনা নয়। ইংল্যাণ্ডের কিংবদন্তী যুগের দুর্ধর্ষ ব্যাট্স্‌ম্যান বা বোলার হয়ত একজনও ছিল না, কিন্তু কয়েকজন ব্যাট্স্‌ম্যান ও বোলার সে যুগের ইংল্যাণ্ডে বিশেষ সুনামী। এই ১৯২২ সনেই কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ানশিপের তালিকায় হ্যাম্পশায়ার ছিল ষষ্ঠ স্থানে। সেই বছরই দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে যাওয়ার সময় এম. সি. সি. এই দল থেকেই ছয় জনকে নির্বাচিত করেছিল—যদিও শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন চারজন, দু-জন ব্যক্তিগত কারণে যেতে পারেন নি।

হ্যাম্পশায়ারের ক্যাপ্টেন ছিলেন লর্ড টেনিসন। বিশাল চেহারা। স্কুলে ফাস্ট বোলার হিসেবে বেশ নাম কিনেছিলেন, কিন্তু এখন ব্যাট্স্‌ম্যান। যে-কোন বলের সামনেই নির্ভীক, তীক্ষ্ণচক্ষু। ফাস্ট বলে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভ করায় তৎপর, শর্ট-পিচ বলে সজোরে হুক। খেলায় মাধুর্য নেই, কিন্তু বোলারের ভীতিস্বরূপ।...

হ্যাম্পশায়ারের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাট্স্‌ম্যান ছিলেন ফিলিপ মীড। ন্যাটা ব্যাট্স্‌ম্যান, অপূর্ব সুন্দর খেলার ভঙ্গি। হ্যাম্পশায়ারের যে-কোন খেলোয়াড়ের চেয়ে মোট বেশি রান করেছেন। মোট রান-সংখ্যা ৪৮,৮৯২। ১৫৩টি সেঞ্চুরি, গড় ৪৭·৬।

জর্জ ব্রাউন ছিলেন সে-যুগের ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার। ব্যাটিং-এ ইংল্যাণ্ডের হয়ে ইনিংস শুরু করতেন। ইংল্যাণ্ডের উইকেট-কীপারও ছিলেন এবং মিডিয়াম ফাস্ট বোলারও ছিলেন। ৬০০-র বেশি তিনি উইকেট নিয়েছেন। মিড-অফের চৌখস ফীল্ডার ছিলেন তিনি। ১৯২১ সনের সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে

ইংল্যাণ্ডের ব্যাট্‌স্‌ম্যানদের মধ্যে তিনিই একমাত্র কোন খেলাতে ব্যর্থ হন নি।

জ্যাক নিউম্যান এবং অ্যালেক কেনেডি তু-জনেই ছিলেন ভাল অলরাউণ্ডার। হ্যাম্পশায়ারের হয়ে এঁরা তু-জনে প্রায় বত্রিশ হাজার রান করেছেন এবং পাঁচ হাজার উইকেট নিয়েছেন। কেনেডি ইংল্যাণ্ডের হয়ে পাঁচটি টেস্টে খেলেছেন।

ওয়াল্টার লিভ্‌সে ছিলেন উইকেট-কীপার। ১৯২২ সনে ইংল্যাণ্ডের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে যান।

স্টুয়ার্ট বয়েস ছিলেন দলের অন্যতম নতুন খেলোয়াড়। বাঁ হাতে ধীর গতিতে স্পিন বল দিতেন।

অ্যালেক বাওয়েল ছিলেন হ্যাম্পশায়ারের ওপেনিং ব্যাট। দ্রুত গতিতে রান তুলতেন, কিন্তু ফাস্ট বলে বিশেষ সুবিধে করতে পারতেন না।

এইচ. এল. ভি. ডে সেই বছরই প্রথম কাউন্টি দলে খেলছেন। পিটিয়ে খেলার পক্ষপাতী। তাঁর প্রথম কাউন্টি ম্যাচেই কেন্টের বিরুদ্ধে তুই ইনিংসে ৫৬ ও ৯১ রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত হন, কিন্তু সামরিক কাজের জন্য যেতে পারেন না।

এ. এস. ম্যাকইণ্টায়ার ছিলেন দলের মধ্যে সবচেয়ে তুর্বল খেলোয়াড়।

ডব্লু আর শার্লি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু। অলরাউণ্ডার, মিডিয়াম ফাস্ট বোলার এবং সুদক্ষ ব্যাট্‌স্‌ম্যান। এই ম্যাচে খেলার কথা হয়, কিন্তু নিয়মিত খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন ইশারউডের অনুপস্থিতির জন্যই দলভুক্ত হন।

এই ছিল সেদিনের হ্যাম্পশায়ারের টীম। তাদের তুলনায় ওয়ারউইকশায়ারের টীম বেশ তুর্বল। নামকরা খেলোয়াড় বলতে তাদের ফাস্ট বোলার হ্যারি হাওয়েল এবং উইকেট-কীপার 'টাইগার' স্মিথ ছাড়া আর কেউ নেই।

দলের ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান বলতে সাণ্টাল ও লেন বেট্‌স্‌। অলরাউণ্ডার ছিলেন দলের ক্যাপ্টেন গাফ-ক্যালথোর্প—ভাল ব্যাট্‌স্‌ম্যান এবং মিডিয়াম ফাস্ট বোলার, আর উইলি কেইক—পঞ্চাশ বছর বয়স, ভাল

ব্যাটসম্যান ও স্লো স্পিনার। স্মিথ ছিলেন উইকেট-কীপার ও ব্যাট্‌স্‌ম্যান। বোলারদের সেরা ফাস্ট বোলার হ্যারি হাওয়েল, নর্ম্যান প্যাট্রিজ—মিডিয়াম ফাস্ট এবং সিরিল স্মার্ট ছিলেন স্লো স্পিনার।

এই ম্যাচ খেলার আগে পর্যন্ত সেই বছর দুই দলই আটটি খেলার মধ্যে চারটি খেলাতে জয়লাভ করেছে।

১৪ই জুন বুধবার।

…এজবাস্টনে আগের দিন বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে। সেদিনকার আকাশের অবস্থা বেশ ভাল। আকাশ বেশ পরিষ্কার, চড়া রোদ উঠেছে। মাঠের পিচটা একটু নরম, কিন্তু তেমন ভীতিকর নয়। লর্ড টেনিসন টসে জিতে ওয়ারউইকশায়ারকে ব্যাট করতে পাঠালেন।

ওয়ারউইকশায়ার ভয়ে-ভয়েই ব্যাট করতে নামল। ভিজে পিচ শুকোনোর সময়ই খুব সাঙ্ঘাতিক হয়ে ওঠে। বল হঠাৎ বেয়াড়া ধরনে লাফিয়ে ওঠে। একটু দেখে-শুনে তাঁরা ব্যাট করতে লাগলেন। ভিজে মাঠে দ্রুত রান তোলা যাচ্ছে না। হ্যাম্পশায়ার এই পিচের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। বল বেশি ঘুরছিল না, তবু স্পিনাররাই যা সাফল্য লাভ করলেন। কেনেডি একদিকের ক্রীজে ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আটকিয়ে রেখে দিলেন, অপর দিক থেকে নিউম্যান আর বয়েস অধিকাংশ উইকেট দখল করে নিলেন। চায়ের বিরতির মধ্যে সব উইকেট হারিয়ে ওয়ারউইকশায়ারের মোট রান হল মাত্র ২২৩। ব্যাটিং-এর দিক থেকে মাত্র দু-জনই যা রান তুলতে পেরেছিলেন। সাণ্টাল করলেন ৮৪ রান এবং ক্যাপ্টেন গাফ-ক্যালথোর্প ৭০। অতিরিক্ত ১৪ রান। বাদবাকি সকলে মিলে করেছিলেন মাত্র ৫৫ রান।

হ্যাম্পশায়ারের সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে লর্ড টেনিসন টসে জিতেও ওয়ারউইকশায়ারকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম ইনিংসে ২২৩ রান এমন কিছু বেশি নয়।

চারটের সময় হ্যাম্পশায়ার তাদের প্রথম ইনিংসের ব্যাট করতে নামল। কড়া রোদ, পিচ তখন শুকিয়ে খট্-খট্ করছে। মীড, ব্রাউন, নিউম্যান, কেনেডি—সকলেই পিচ পরীক্ষা করে দেখে বললেন—ব্যাট্‌স্‌ম্যানের স্বর্গ। হ্যাম্পশায়ারের ব্যাট্‌স্‌ম্যানের সুদীর্ঘ তালিকা দেখে শঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন গাফ-ক্যালথোর্প। মীড, ব্রাউন, টেনিসন, নিউম্যান, কেনেডি, বাওয়েল, ডে—এত সুন্দর পিচে এতগুলো সুদক্ষ ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে আউট করা খুব সহজ নয়।

ব্যাট করতে নামলেন বাওয়েল এবং ডে। বল নিলেন হাওয়েল। এত জোর বল আর বোধহয় কোনদিন তিনি দেন নি। প্রথম ওভারেই বাওয়েলের মিড্‌ল্ স্টাম্প তিনি ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। এলেন কেনেডি, কিন্তু পরের বলেই তিনি আউট। শূন্য রানে দুই উইকেট।

অপর দিক থেকে বল দিতে শুরু করলেন গাফ-ক্যালথোর্প। বলকে ভীষণভাবে সুইং করাতে লাগলেন। ক্যালথোর্পের বলে শূন্য রানে বোল্ড আউট হলেন ডে। তিন উইকেটে শূন্য রান। এবারে একত্রিত হলেন ফিলিপ মীড আর জর্জ ব্রাউন—হ্যাম্পশায়ারের শ্রেষ্ঠ দুই খেলোয়াড়। এখন এঁরা দু-জনেই হ্যাম্পশায়ারের একমাত্র ভরসা, এঁরা দু-জনেই যদি দলকে রক্ষা করতে পারেন। বিপদ বুঝে মীড হাওয়েলকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ব্রাউন চিরকালের খেয়ালী ব্যাট্‌স্‌ম্যান, দলের দুর্যোগ বুঝে খেলবার চেষ্টা করলেন না। হাওয়েলের বলে শূন্য রানে আউট। মাত্র এক রানে চার উইকেট।

হ্যাম্পশায়ার আর দাঁড়াতে পারল না। খেলা শুরু হওয়ার চল্লিশ মিনিটের মধ্যে মাত্র নয় ওভার খেলে সমস্ত উইকেট হারিয়ে মাত্র পনের রান করল। একমাত্র মীড শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিলেন—নট আউট ছয় রান। হ্যারি বাওয়েল পাঁচ ওভার বল দিয়ে সাত রানে ছয় উইকেট পেলেন এবং গাফ-ক্যালথোর্প পেলেন চার ওভারে চার রান দিয়ে চার উইকেট। অতিরিক্ত চার রান।

গাফ-ক্যালথোর্প হ্যাম্পশায়ারকে ফলো-অন করতে পাঠালেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে আবার বাওয়েল এবং ডে। সেদিন তাঁরা মাটি কামড়িয়ে পড়ে রইলেন। রান মাত্র এক।

দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হল। দিনের প্রথম ওভারেই হাওয়েল ডে-র উইকেট নিলেন। এলেন ফিলিপ মীড। আর সেই বেপরোয়া ব্যাট্‌স্‌ম্যান নন যে নির্ভীক পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে যে-কোন মারাত্মক বলকে মাঠের চতুর্দিকে ছুটিয়ে বেড়াবেন। প্রথম ইনিংসের লজ্জা এবং গ্লানি তাঁর ঘাড়ে এক দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খেলা খেলতে না পেরে তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন। হাওয়েলের একটু দেরিতে-সুইং-করা এক ইয়র্কারে তিনি যখন বোল্ড আউট হলেন, তখন দলের রান-সংখ্যা দুই উইকেটে মাত্র ২৪।

হ্যাম্পশায়ারের পরাজয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। দলের আর এক ধুরন্ধর ব্যাটস্‌ম্যান জর্জ ব্রাউন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি তখন ব্যাট করতে পারলেন না। ব্যাট করতে নামলেন লর্ড টেনিসন—খেলায় সৌকর্য না থাক, মারে জোর আছে—সমস্ত খেলায় একটু বেপরোয়া ভাব। ১৯২১ সনের লীডসের টেস্টে বাঁ হাতে আঘাত লাগার পর গ্রেগরি এবং ম্যাকডোণাল্ডের মত দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে শুধু ডান হাতে ব্যাট ধরেই তিনি ৬৩ রান করেন।

ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচা দরকার। লর্ড টেনিসন মরিয়া হয়ে দলের রান বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি দিলেন। কিন্তু এদিকে বাওয়েল বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। টেনিসনও পিটিয়ে ৪৫ রান করে আউট হয়ে গেলেন। এলেন কেনেডি আর নিউম্যান। হাওয়েলের বলে আউট হয়ে গেলেন কেনেডি। নামলেন শার্লি। শার্লিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন জ্যাক নিউমান। নিজে হাওয়েলের বলের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু নিউম্যান যখন আউট হয়ে গেলেন তখন হ্যাম্পশায়ারের ৬ উইকেটে মাত্র ১৭৭ রান। ইনিংসের পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে আরো ৩১ রানের প্রয়োজন।

দলের শেষ ব্যাট্‌স্‌ম্যান জর্জ ব্রাউন অসুস্থ শরীর নিয়েও খেলতে নামলেন। তাঁরই কাঁধের ওপর এখন দলের সমস্ত ভার। নিজের স্বাভাবিক

খেলার কথা ভুলে গেলেন। প্রতিটি বলের সামনে সোজা করে ব্যাট পাততে লাগলেন, কিন্তু সুযোগ পেলে রান করতে ছাড়লেন না। গাফ-ক্যালথোর্পের বলে শার্লি যখন আউট হলেন তখন সপ্তম উইকেটের জুটিতে তাঁরা ৮৫ রান করেছেন। ৭ উইকেটে ২৫২—ওয়ারউইকশায়ারের চেয়ে মাত্র ৪৪ রানে এগিয়ে। এলেন ম্যাকইন্টায়ার। হাওয়েল সহজেই তাঁর উইকেট দখল করলেন। হ্যাম্পশায়ারের ৮ উইকেটে ২৭৪ রান। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হল।

খেলার আরো একদিন বাকি। হ্যাম্পশায়ার মাত্র ৬৯ রানে এগিয়ে, হাতে মাত্র দুই উইকেট এবং শেষ দু-জনের ব্যাটিং-এ কোনকালে নাম ছিল না। লিভ্‌সে ৩৩টি খেলায় গড়ে ৫ রান করেছেন, মাত্র তিনবার দশের বেশি রান করতে পেরেছেন। বয়েস চিরকাল এক বলের খদ্দের।

সুতরাং অবধারিত পরাজয়ের হতাশা নিয়ে হ্যাম্পশায়ার তৃতীয় দিন মাঠে নামল।

ব্রাউন লিভ্‌সেকে বাঁচিয়ে একাই খেলে যেতে লাগলেন। হাওয়েলের মুখোমুখি সব সময়ে দাঁড়ালেন তিনি, ওয়ারউইকের স্লো বোলার ভাল না থাকায় তাদের সঙ্গে যুঝতে দিলেন লিভ্‌সেকে। কিভাবে ব্যাট ধরতে হবে, কিভাবে বল মারতে হবে—ব্রাউন বলে দিতে লাগলেন। হাওয়েল আর কোয়েফের বলকে বেপরোয়া মেরে নির্জীব, নির্বিষ করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত সিরিল স্মার্টের বলে আউট হলেন জর্জ ব্রাউন। তাঁর ব্যক্তিগত রান ১৭২; নবম উইকেটের জুটির রান-সংখ্যা ১৭৭। হ্যাম্পশায়ার ২৪৩ রানে এগিয়ে।

হ্যাম্পশায়ারের খেলা এবার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু ক্রিকেট খেলার অবিশ্বাস্য মতিগতি কেউ বুঝে উঠতে পারে না। এবারে খেলাটি এক অদ্ভুত মোড় নিল। শেষ দু-জন খেলোয়াড় ব্যাট করতে জানেন না। ব্যাটিংয়ের আইনকানুনের ধার না ধেরে বেপরোয়া ব্যাট চালাতে লাগলেন। লিভ্‌সে তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ সেঞ্চুরি করলেন। শেষ পর্যন্ত বয়েস যখন আউট হলেন তখন হ্যাম্পশায়ারের মোট রান-সংখ্যা ৫২১। হ্যাম্পশায়ার ফলো অন করেও ৩১৩ রানে এগিয়ে।

৩১৪ রান করতে পারলে জয়। ওয়ারউইকশায়ার ব্যাট করতে নামল। এবারে খেলার লাগাম হ্যাম্পশায়ারের হাতে। পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে ওয়ারউইকশায়ার স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারল না। বয়েস ভার ব্রাউনকে মাত্র কয়েক ওভার বল করতে দিয়ে টেনিসন অধিকাংশ সময় আক্রমণের দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন কেনেডি এবং নিউম্যানের ওপর। দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে স্মিথ এবং কোয়েফই যা ৭৫ রান করতে পারলেন। নয়তো কেনেডি এবং নিউম্যান ওয়ারউইকশায়ারকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে গেলেন। মাত্র ১২ রানে ৫ উইকেট পড়ে গিয়েছিল এক সময়ে। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়ারউইকশায়ার করতে পেরেছিল মাত্র ১৫৮ রান।

হ্যাম্পশায়ার ১৫৫ রানে জয়লাভ করল।

অথচ প্রথম ইনিংসে তারা করেছিল মাত্র ১৫ রান। কী আশ্চর্য খেলা এই ক্রিকেট!

ডিসেম্বরের সেই সকাল

মঙ্গলবার। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৬।

এই দিনটি ভারতবর্ষের টেনিস-জগৎ কোনদিন ভুলতে পারবে না। ভারতবর্ষের টেনিস খেলার ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল নতুন অধ্যায় লিখিত হয়েছিল ওই মঙ্গলবারের এক নাতিশীতোষ্ণ সকালে। শুধু ভারতের কেন, এশিয়ার টেনিস-জগতেরও এক স্মরণীয় সকাল সেটি।

ওই দিন ভারতবর্ষ এশিয়ার সমস্ত দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠেছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতি বছর যে টেনিস-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই বলে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা। সাধারণ প্রতিযোগিতার থেকে এর নিয়ম একটু স্বতন্ত্র। পূর্ব-বৎসরের ডেভিস কাপ বিজয়ীকে আর অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রথম থেকেই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয় না। বিশ্বের দেশগুলিকে বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে প্রথমে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগী দেশদের চারটি সিঙ্গল্‌স্ এবং একটি ডাবল্‌স্ খেলায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এই পাঁচটি খেলার মধ্যে যে-দেশ তিনটি খেলায় বিজয়ী হবে, তাকেই পরবর্তী রাউণ্ডের খেলায় উন্নীত করা হয়। আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ানদের মধ্যে যে চ্যাম্পিয়ান হবে, সে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ওঠে এবং পূর্ববৎসরের বিজয়ীকে চ্যালেঞ্জ করার গৌরব অর্জন করে। 'রেইনিং' চ্যাম্পিয়ানের দেশে গিয়ে খেলে বিজয়-মুকুট ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করতে হয়।

এক হকি এবং বিলিয়ার্ড ছাড়া আর সমস্ত রকম খেলায় ভারতবর্ষ বিশ্বমানের এত নিচু পর্যায়ে যে কোন বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় আমরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারি নি। টেনিসের বেলাতেও ঠিক তাই। এদেশে প্রতিভাবান টেনিস খেলোয়াড় যা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের হাতে

শোনা যায়—গউস মহম্মদ (প্রথম ভারতীয়, যিনি উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছিলেন), দিলীপ বসু, যিনি প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান এবং প্রথম ভারতীয় যিনি উইম্বলডন প্রতিযোগিতয়ে 'সীডিং' বা শীর্ষ-তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন), নরেশ কুমার এবং রামনাথন কৃষ্ণন।

বিগত এক যুগ ধরে রামনাথন কৃষ্ণনই ভারতবর্ষের একমাত্র আশা ও ভরসা। বর্তমান যুগের 'পাওয়ার' টেনিস তিনি খেলতে পারেন না, তাঁর খেলায় আছে আদিযুগের ছন্দ-সুকুমার লালিত্য ও বুদ্ধিদৃপ্ত মার। যেদিন তাঁর খেলা খোলে, সেদিন তিনি বিশ্বের যেকোন খেলোয়াড়কে কাবু করতে পারেন, আবার অন্যান্য দিন 'পাওয়ার' টেনিসের প্রবল সার্ভিস, মার, এবং নেট খেলার কাছে স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন না। ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের শারীরিক পটুতা কৃষ্ণনের চেয়ে অনেক বেশি।

এই কৃষ্ণনের অপূর্ব খেলার জন্যই ভারতবর্ষ ইতিপূর্বে চার বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রতিযোগিতা করার প্রায় সম্মুখীন হতে পেরেছিল, অর্থাৎ আন্তঃ-আঞ্চলিক ফাইনালে উঠেছিল; কিন্তু প্রতিবারই চ্যালেঞ্জ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৫৯ সনে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৬৩ সনে মেক্সিকো, ১৯৬৪ সনে আমেরিকা এবং ১৯৬৫ সনে স্পেন ভারতের সেই আশা সফল হতে দেয় নি। আবার ১৯৬৬ সনে তাদের সে সুযোগ এল। এবারও কি তাদের সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত হতে হবে ?

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের পূর্ববর্তী আন্তঃআঞ্চলিক ফাইনাল প্রতিযোগিতা এবার ভারত ও ব্রেজিলের মধ্যে খেলা হবে কলকাতায়, সাউথ ক্লাবের সেণ্টার কোর্টে।

ভারতের টিমে মনোনীত হলেন রামনাথন কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিত লাল। ব্রেজিলের দলে খেলতে এসেছেন টমাস কক এবং ই. ম্যাণ্ডারিনো। প্রথম দিনের সিঙ্গলসে খেলবেন জয়দীপ মুখার্জি ও টমাস কক এবং রামনাথ কৃষ্ণন ও ম্যাণ্ডারিনো। তার পরের দিন ডাবল্‌স্ খেলা এবং তৃতীয় দিন বিপরীত সিঙ্গল্‌স্—জয়দীপ ও ম্যাণ্ডারিনো এবং কৃষ্ণন ও কক।

শনিবার ৩রা ডিসেম্বর শুরু হল এই খেলা। এত বড় খেলা এবং এইরকম উদ্দীপনা এর আগে দেখা যায় নি। আট হাজার দর্শক খেলা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রতিটি আসন দখল করে বসে আছেন।

ব্রেজিলের এক নম্বর খেলোয়াড় টমাস কক প্রথম সিঙ্গলসে অতি সহজেই জয়দীপ মুখার্জিকে স্ট্রেট সেটে ৬-২, ৬-২, ৬-৩ গেমে পরাজিত করে ব্রেজিলকে প্রথম খেলায় জয়ী করলেন।

দ্বিতীয় খেলা হল কৃষ্ণন ও ম্যাণ্ডারিনোর মধ্যে। প্রথম সেটে কৃষ্ণন ৫-৭ গেমে পরাজিত হলেন। দর্শকদের মন একেবারে দমে গেল: এবারও ভারত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে যেতে পারবে না, পর-পর চার বছর আন্তঃ-আঞ্চলিক ফাইনালে উঠে পরাজিত হবে? কিন্তু কৃষ্ণন প্রথম সেটের পর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে ম্যাণ্ডারিনোকে সহজেই জাদুবদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত ৫-৭, ৬-২, ৬-৩, ৬-৪ গেমে জয়লাভ করলেন।

প্রথম দিনে ভারত ও ব্রেজিলের খেলার ফল সমান-সমান, ১-১।

রবিবার ডাবল্‌স্‌ খেলা। প্রথমে স্থির ছিল যে কৃষ্ণনের পার্টনার হয়ে খেলবেন প্রেমজিত লাল; কিন্তু কৃষ্ণন শেষ পর্যন্ত মস্ত বড় এক ঝুঁকি নিলেন। প্রেমজিতের বদলে জয়দীপকে পার্টনার নিলেন। এই ডাবল্‌স্‌ খেলার ওপরই নির্ভর করছে অনেকখানি শেষ ফলাফলের—ভারতের কাছে তো নিশ্চয়ই।

জয়দীপকে ডাবল্‌সে খেলানোর জন্যে সকলে বিস্মিত এবং কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। আগের দিনে ককের বিরুদ্ধে খেলা দেখে কেউ তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি। কিন্তু কৃষ্ণনের খেলোয়াড় চিনতে ভুল হয় নি। ডাবল্‌স্‌ খেলায় কৃষ্ণন ও জয়দীপের জুটি কক ও ম্যাণ্ডারিনোকে পরাজিত করলেন ৭-৫, ৩-৬, ৬-৩, ৪-৬ ও ৬-৩ গেমে।

রবিবার পর্যন্ত ভারত ২-১ খেলায় অগ্রসর হয়ে রইল। ভারতের মাত্র আর দুটি খেলার মধ্যে একটিতে জয়লাভ চাই। কিন্তু সে আশা প্রায় সুদূর পরাহত। খেলার নমুনা দেখে মনে হয় জয়দীপের জয়লাভের কোন আশা নেই, এবং তরুণ খেলোয়াড় ককের সঙ্গে বয়স্ক কৃষ্ণনের এঁটে ওঠা শক্ত।

সোমবার প্রথম খেলাতে জয়দীপ জয়লাভের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেও এবং অত্যন্ত চমৎকার খেলেও প্রথম ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ম্যাণ্ডারিনোর কাছে ৩-২ সেটে পরাজিত হলেন।

ভারত ও ব্রেজিলের খেলার ফল ড্র, ২-২।

এবার শেষ খেলা কৃষ্ণন বনাম কক।

কৃষ্ণনের কাঁধে গুরু ভার। তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সমগ্র ভারত। ব্রেজিলের এক নম্বর খেলোয়াড় কককে পরাজিত করতে পারলেই ভারত চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে যেতে পারবে। এক গুরু দায়িত্ব এবং দুর্ভাবনা নিয়ে খেলতে নামলেন কৃষ্ণন।

প্রথম সেটে কক কৃষ্ণনকে শক্তিশালী সার্ভিস ও শট দিয়ে একরকম কোণঠাসা করে ৭-৫ গেমে জিতলেন। দ্বিতীয় সেটে কৃষ্ণন জয়লাভ করলেন ৬-৪ গেমে। তৃতীয় সেটে চলল মরণ-পণ সংগ্রাম, দু-জনেই এই সেটে জয়লাভের জন্য মরিয়া হয়ে খেলতে লাগলেন। সহজে কেউ পরাজয় স্বীকার করছেন না—একটি গেমে কক জয়লাভ করলে পরের গেমে জয়লাভ করছেন কৃষ্ণন। সুদীর্ঘ সময় ধরে বাইশটি গেম খেলার পর সেটটির নিষ্পত্তি হল। কক জয়লাভ করলেন ১২-১০ গেমে।

অন্ধকার হয়ে আসায় সেদিনের মত খেলা শেষ। ব্রেজিলের ভাগ্য-দেবীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ব্রেজিল সেই রাত্রি নিশ্চিন্ত মনে রইল। ভারতের আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। কৃষ্ণনের চেয়ে কক উন্নত খেলার পরিচয় দিয়েছেন এবং পরদিন মাত্র একটি সেটে জয়লাভ করলেই ব্রেজিল জয়ী হবে। ভারতকে জয়ী করতে হলে কৃষ্ণনকে ককের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে বাকি দুটি সেটই—যা প্রায় অসম্ভব।

সেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা ৬ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার।

পরাজয় একরকম নিশ্চিত, তবু খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো বিশ্বাস নেই! অসম্ভব কল্পনা করেও আট হাজার দর্শক সেই শীতের সকালে এসেছেন সাউথ ক্লাবে। না এলে তাঁরা এক আশ্চর্য খেলা, এক বৈপ্লবিক পুনরুজ্জীবন এবং অনস্বীকার্য প্রতিভার অমর দীপ্তি থেকে বঞ্চিত হতেন।

আত্মবিশ্বাসের এক শান্ত প্রতিমূর্তি যেন কক। মাত্র চতুর্থ সেটে

জয়লাভ করলেই বিজয়-মুকুট দখল হবে। বাঁ হাতে প্রবল জোরে কোনা-কুনি সার্ভিস করে কক প্রথম গেমে সহজেই জয়ী হলেন (১-০) দ্বিতীয় গেমে কৃষ্ণনের সার্ভিস থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণনকে একেবারে দাঁড়াতে দিলেন না। এবারে সাভিস ককের ; সহজ জয়লাভ (৩-০)। কৃষ্ণন একেবারে দাঁড়াতে পারছেন না, পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে এই সেট শেষ হয়ে যাবে। দর্শকদের মুখ হতাশায় কালি হয়ে উঠল। কৃষ্ণনের এতবড় ব্যর্থতা আর দেখা যায় নি। ককের প্রবল দাপটের কাছে কৃষ্ণন পর-পর তিনটি গেমে হেরে গেলেন। চতুর্থ গেমে কক অতি সহজেই ৩০-১৫ পয়েন্টে এগিয়ে রইলেন।

এবারে যেন কৃষ্ণন তাঁর খেলা ফিরে পেলেন। কৃষ্ণন ককের বল-গুলিকে দূর কোণে কোণে মেরে পাঠাতে লাগলেন। ককরে কিছুতেই নেটের কাছে দাঁড়াতে দিলেন না। কৃষ্ণনের বলগুলিকে ফেরত দেওয়ার জন্য এবার ককরে সারা কোর্ট ছুটে বেড়াতে হল। কৃষ্ণন ধীরে ধীরে খেলার ওপর নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে লাগলেন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কৃষ্ণনের স্থিরবুদ্ধির খেলায় বার-বার পরাজিত হতে লাগলেন কক। সেই গেম জিতলেন কৃষ্ণন। হল ১-৩।

এবারে প্রতিযোগিতা আর অত সহজ এবং একতরফা নয়। এবার কক নিজের সার্ভিসের গেম নিয়ে করলেন (৪-১), তারপর দু-জনে যে-যার সার্ভিস-গেম পেতে পেতে এক সময়ে স্কোর হল ককের পক্ষে ৫-৩। আর এবার ককের সার্ভিস ভাঙলে স্কোর হবে ককের পক্ষে (৫-৪)। কক বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণন তাঁকে যেভাবে চেপে ধরছেন তাতে আর তাঁর পরিত্রাণ নেই। এখন আর একটি গেমে জয়লাভ করলেই কক এই সেটে জয়লাভ করবেন অর্থাৎ ব্রেজিল নিয়ে যাবে।

কিন্তু কৃষ্ণন বিচলিত হলেন না। ঠাণ্ডা মাথায় তিনি ককের খেলাকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এলেন এবং নেটের বিভিন্ন কোণে বল মেরে ককরে নেট থেকে সরিয়ে রাখলেন। কৃষ্ণনের খেলার এই চাতুরীর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে কক বিচলিত হয়ে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর অব্যর্থ

সার্ভিসও ভুল হতে লাগল। কক 'ডবল ফল্ট' বা পর-পর দুটো সার্ভিসই ভুল করায় সেই গেমে কৃষ্ণন জয়লাভ করলেন (৪-৫)।

কক তবু আশা ছাড়লেন না। এখনও যথেষ্ট আশা আছে, এই একটি গেমে জয়লাভ চাই, তাহলেও ব্রেজিলের জয়। কিন্তু কৃষ্ণন এক অদম্য আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন, এখন তিনি অপরাজেয়। দশম গেমে প্রবল সার্ভিসে তিনি জয়লাভ করে খেলার ফলাফল সমান করলেন (৫-৫)।

সহজ জয় হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—কক অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়লেন। চোখ মুখ দিয়ে ঝর-ঝর করে ঘাম ঝরছে; আর নিজের ওপর আস্থা নেই। নিজের সার্ভিস গেমে পরাজিত হলেন (৫-৬)। দ্বাদশ গেমে কৃষ্ণনের সার্ভিস। চমৎকার মাপা সার্ভিসে তিনি ৪০-০ পয়েন্টে এগিয়ে গেলেন; কিন্তু এবার কক প্রাণপণে দুটি সেট-পয়েন্ট বাঁচালেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না কক, কৃষ্ণন চতুর্থ সেট জিতলেন ৭-৫ গেমে।

শেষ সেট খেলার জন্য তৈরি হলেন কৃষ্ণন এবং কক; কিন্তু ককের মনোবল ভেঙে গেছে, নিজের খেলার ওপর আর কোন বিশ্বাস নেই। কৃষ্ণন এই সেট অতি সহজেই ৬-২ গেমে জয়লাভ করলেন। এই শেষ খেলাতে কৃষ্ণন জয়লাভ করলেন ৩-৬, ৬-৪, ১০-১২, ৭-৫, ৬-২ গেমে।

ব্রেজিলের বিরুদ্ধে ৩-২ গেমে জয়লাভ করে ভারতবর্ষ সেই প্রথমবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উন্নীত হল, এবং অস্ট্রেলিয়াকে চ্যালেঞ্জ করার গৌরব অর্জন করল।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার ইতিহাসে এ-ধরনের আর একটা নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৬৫ সন। ইন্টার সিটিজ ফেয়ার্স কাপের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের খেলা। ইংল্যাণ্ডের চেলসি বনাম ইটালির এ.এস. রোমা।

প্রথম লেগের খেলায় সেপ্টেম্বর মাসে চেলসি রোমাকে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের মাঠে ৭-১ গোলে সহজেই পরাজিত করে। দ্বিতীয় লেগের খেলাতেও চেলসি সহজেই জয়লাভ করবে—সকলেই এই আশা করেছিলেন।

কিন্তু রোমে রোমানদের সামনে রোমানদের বিরুদ্ধে খেলে জয়লাভ করা যে কত কঠিন, চেলসি তা কল্পনাও করতে পারে নি।

ইংল্যাণ্ডের চেলসির বিরুদ্ধে তাদের প্রিয় ক্লাব রোমার এই নিদারুণ পরাজয় ইটালিয়ানরা সহজ মনে গ্রহণ করতে পারল না। দৈনিক পত্র-পত্রিকাও তাদের দেশের চ্যাম্পিয়ান ফুটবল দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্য দায়ী করল একমাত্র চেলসিকে। রোমা যে চেলসির উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যের কাছে পরাজিত হয়েছে—এ কথা তারা মেনেও মানল না। প্রতিদিন তাদের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হতে লাগল—চেলসির কাছে রোমার পরাজয়ের প্রতিশোধ চাই। দ্বিতীয় লেগের খেলায় চেলসি যেন রোমে এসে চরম শিক্ষা লাভ করে।

রোমের আকাশ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠতে লাগল। উদগ্র আগ্রহে রোমবাসীরা অপেক্ষা করতে লাগল রোমে চেলসির আগমনের সময়ের।

দ্বিতীয় লেগের খেলার জন্য চেলসির খেলোয়াড়রা যখন লণ্ডন থেকে

প্লেনে চড়লেন, তখন পর্যন্ত তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি যে রোমবাসীরা তাঁদের 'চরম শিক্ষা' দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রেখেছেন।

রোমে এসে পৌঁছনোর পরই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল চেলসি এবং ইংল্যাণ্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জো মিয়ার্সের। জো মিয়ার্সের সঙ্গে কর-মর্দন করে রোমার প্রেসিডেন্ট জানালেন যে তাঁর অনুমতি না নিয়েই দর্শকদের সুবিধার জন্য খেলার মাঠ পরিবর্তন করতে হয়েছে! রোমার মাঠের পরিবর্তে খেলা হবে ফ্লামিনিও স্টেডিয়ামে।

খেলার নিয়মানুযায়ী এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল রোমা ক্লাবের নিজের মাঠে। মাঠ পরিবর্তন করতে হলে অপর পক্ষের সম্মতি প্রয়োজন। খেলার মাঠ ভাল হলে এই পরিবর্তনে জো মিয়ার্সের বিশেষ আপত্তি ছিল না! রোমার প্রেসিডেন্ট মিয়ার্সকে ফ্লামিনিও স্টেডিয়াম দেখাতে নিয়ে গেলেন।

স্টেডিয়াম দেখে মুগ্ধ হলেন মিয়ার্স। ঝকঝকে তকতকে স্টেডিয়াম। খেলার মাঠ সুন্দর সবুজ ঘাসে পূর্ণ। মাঠের চারপাশ ঘিরে এক হাত উঁচু পাতাবাহার গাছের লাইন, তারপরেই দর্শকদের বসবার জায়গা। গ্যালারির নিচে মাটির তলায় সুন্দর সাজানো অফিস, খেলোয়াড়দের বসবার জায়গা।

এই মাঠে খেলতে মিয়ার্সের আপত্তি হল না।

কিন্তু এই খবর শুনে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন চেলসির ম্যানেজার টমি ডোকার্টি। মিয়ার্সকে তিনি বললেন—মাঠ পরিবর্তনে রাজি কেন হলেন, জো? রোমার মাঠে দর্শকদের আসন তারের জাল দিয়ে ঘেরা, কিন্তু ফ্লামিনিও স্টেডিয়াম তো চারদিক খোলা।

মিয়ার্স জিজ্ঞাসা করলেন—তাতে ভয় পাবার কী আছে?

ডোকার্টি উত্তর দিলেন—ভরসাই বা কোথায়? রোমের ফুটবল দর্শকদের মতিগতি বোঝা ভার। আমার খুব ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যাবেলায় চেলসির ট্রেনার হ্যারি মেডহার্স্ট অনুশীলনের জন্য যখন খেলোয়াড়দের তৈরি করছেন, তখন তাঁকে জানানো হল যে রাত্রে তাঁদের অনুশীলন করার জন্য কোন ফ্লাডবাতি-আলোকিত মাঠ পাওয়া সম্ভব

নয়। ফ্লামিনিও স্টেডিয়ামই শুধু আলোকিত, সেখানে রোমা অনুশীলন করছে।

মেডহার্স্ট বিরক্ত এবং শঙ্কিত হলেন। অতিথি-পরায়ণ ইটালিয়ানদের এ কেমন অতিথি-সৎকারের নমুনা! ইতিপূর্বে রোমা যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল, তখন তাঁরা অতিথিদের সর্বপ্রকার সুবিধা দিয়েছিলেন। ফ্লাড-বাতি-আলোকিত মাঠেই যেখানে খেলা স্থির হয়েছে, সেখানে এইরকম মাঠে অনুশীলন না করতে পারলে চলবে কেন?

কিন্তু যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে কাকে?

খেলার দিন তুপুরবেলা থেকে দলে দলে ইটালিয়ান মাঠে হাজির হতে লাগল। প্রায় প্রত্যেকেরই হাতে বা কাঁধে বিরাট বড়-বড় ব্যাগ কিংবা সুটকেস। চেলসিকে শিক্ষা দেওয়ার সমস্ত রকম সরঞ্জাম নিয়ে তারা মজা দেখতে এসেছে।

সন্ধ্যাবেলায় তুই দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হল :—

	চেলসি	রোমা
গোল	বনেটি	কুদিসিনি
ব্যাক	শেলিটো	তোমাসিন
	ম্যাকক্রিডি	কার্পেনিতি
হাফব্যাক	হলিস	কার্পানেসি
	হিণ্টন	লোসি
	হ্যারিস	বেনাগ্লিয়া
ফরোয়ার্ড	মারে	তাম্বোরিনি
	গ্রাহাম	লিওনার্দি
	ব্রিজেস	ফ্রান্সেসকোনি
	ভেনেবল্‌স্	বেনিতেজ
	বয়েল	নার্দোনি
রেফারি		বাউমগার্টনার (জার্মানি)

মিয়ার্স আর ডোকার্টি মাঠ পরিদর্শনে নামা-মাত্র কয়েক ঝুড়ি আবর্জনা আর ইট-পাটকেল পড়ল তাঁদের ওপর। মাঠ পরিদর্শন মাথায় উঠল

তাঁদের। দৌড়ে গিয়ে তাঁরা স্টেডিয়ামের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁরা ধারণা করতে পারেন নি যে বৃহত্তর ব্যাপারের এটাই হল উপক্রমণিকা। খেলার মাঠে এ ধরনের হৈ-চৈ বা দু-চারটে ইট-পাটকেল কোন্ খেলায় না পড়ে?

চেলসির খেলোয়াড়দের নিয়ে বেরুলেন ম্যানেজার ডোকার্টি, কোচ মেডহার্স্ট এবং ডক্টর পল বয়েন। খেলোয়াড়েরা মাঠে নামল, কিন্তু সমস্ত মাঠ চুপচাপ—ঝড়ের পূর্বাভাসের মত। ডোকার্টি, মেডহার্স্ট এবং ডক্টর বয়েন অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের নিয়ে বড় স্টেডিয়ামের সামনের কয়েকটা চেয়ার দখল করে বসলেন। কিন্তু রোমা দলের ম্যানেজার ওরোঞ্জো পুগলিয়েসে সবিনয়ে জানালেন যে সেই আসনগুলো রোমা দলের জন্য রক্ষিত, তাঁদের বসবার স্থান হয়েছে মাঠের অপর প্রান্তে সাধারণ দর্শক-গ্যালারির নিচে।

নির্দিষ্ট আসনে বসামাত্রই ওপর থেকে তাঁদের ওপর পড়তে লাগল টমেটো, পচা শাকসব্জি। ব্যতিব্যস্ত হয়ে ডক্টর বয়েন উঠে দাঁড়ানোমাত্র তাঁর মাথায় এক কেটলি গরম চা ঝরে পড়ল।

খেলার মাঠের অবস্থাও খুব ভাল নয়। রোমা দল মাঠে শুধু একটা বল নিয়ে নেমেছে। চেলসির জন্য বল আনতে তারা ভুলে গিয়েছে। সুতরাং খেলা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত যতক্ষণ রোমা দল প্রাথমিক অনুশীলন করতে লাগল, ততক্ষণ চেলসি দল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রেফারির বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে রোমের দর্শক-দল একত্রে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। এইবার শুরু হল তাদের খেলা, যার জন্য তারা এতদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছে। ইঁট-পাটকেল, পাথর, পচা ডিম, টমেটো, পচা সব্জি, কাঁচের গেলাস, চায়ের কাপ, মাটির ভাঁড় শিলাবৃষ্টির মত মাঠে পড়তে লাগল। এক হাত লম্বা একটা ধারালো লোহার পাইপ বর্শার মত এসে চেলসির গোলকীপারের মাত্র কয়েক হাত দূরে এসে গেঁথে পড়ল।

এইসব জিনিস দিয়ে অবশ্য ইটালিয়ানরা চেলসির খেলোয়াড়দের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল; কিন্তু ফুটবলের মত এ রকম ক্ষিপ্রগতি খেলায় সব সময়ে লোক লক্ষ্য করে মারাও কঠিন। লিওনার্দি বল নিয়ে চেলসির

রক্ষণভাগ ভেদ করে দ্রুত গতিতে গোলের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। চেলসির গোলকীপার বনেটি বলটি ধরার জন্য অগ্রসর হতেই উৎসাহী দর্শকেরা বনেটিকে লক্ষ্য করে ডিম আর টমেটো ছুঁড়তে লাগল। বনেটি সেই মুহূর্তে ডাইভ করলেন লিওনার্দির পায়ের ওপর। হঠাৎ একটা টমেটো সজোরে এসে লাগল দ্রুতগতিতে ছুটে আসা লিওনার্দির মুখের ওপর। অতর্কিত এই আঘাতে বল নিয়ে থমকে দাঁড়ালেন লিওনার্দি। ঠিক সেই সময় আর একটা ডিম এসে পড়ল তাঁর মাথায়। হতভম্ব লিওনার্দির পায়ের ওপর থেকে বনেটি বলটি তুলে নিলেন। লিওনার্দির ভাগ্য ভাল যে টমেটো আর ডিমের ওপর দিয়েই তাঁর ফাঁড়া কেটে গেল।

কিন্তু চেলসির লেফট আউট বয়েল বল নিয়ে দৌড় দেওয়ামাত্রই তাঁর মাথায় সজোরে এসে পড়ল একটি মদের বোতল। বল ফেলে দিয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়লেন তিনি, মাথা ফেটে গেছে। কিন্তু তবু তাঁর পরিত্রাণ নেই—তখনও ইট-পাথর ছুটে আসছে। রোমার ক্যাপ্টেন লোসি দর্শকদের শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লক্ষ্য করেই ইষ্টকবৃষ্টি শুরু হল। তারপর ঘায়েল হলেন চেলসির লেফট ব্যাক ম্যাক্‌ক্রিডি। তাঁর মাথায় পড়ল ছুটো পাথর। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

রোমার ম্যানেজার পুগলিয়েসে দর্শকদের শান্ত করার জন্য গ্যালারির দিকে ছুটে গেলেন। শিস আর চিৎকারে তাঁকে প্রথমে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করল দর্শকেরা; তাতেও সক্ষম না হয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল উড়ন তুবড়ি, হাউই আর পটকা। পুগলিয়েসে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।

হাফ-টাইম।

এতক্ষণ সমস্ত আক্রমণ চলছিল চেলসির ওপর, কিন্তু এবার যেন রোমার খেলোয়াড়েরাও বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না। মাঠে নামতেই তাদের সাহস হচ্ছে না।

স্টেডিয়ামে তখন দর্শকদের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। পুলিশদের মাঠে নামবার অধিকার নেই, দর্শকেরা তাই যথেচ্ছাচার করতে সাহস করছে।

রেফারি বাউমগার্টনার লাইনসম্যানদের নিয়ে মাঠে নামামাত্র দর্শকেরা ইট-পাটকেল আর বাজি ছুঁড়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। কোন লাইনসম্যানই গ্যালারির দিকের লাইনে দাঁড়াতে সাহস করছেন না। শেষ পর্যন্ত একই দিকে দু-জনে দাঁড়ালেন।

কিন্তু খেলোয়াড়েরা আর মাঠে নামে না। রোমা দল চেলসিকে আগে মাঠে নামতে অনুরোধ করছে যাতে ইট-পাটকেলের প্রথম ঝাপটা তাদের ওপর দিয়েই যায়। কিন্তু চেলসির খেলোয়াড়রাও ততক্ষণে বেশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। তারাও কিছুতেই আগে নামবে না। রোমা দলের খেলোয়াড়েরা তখন চেলসির খেলোয়াড়দের জোর করে ঠেলে মাঠে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। চেলসির খেলোয়াড়রা আত্মরক্ষার জন্য এক একজন রোমার খেলোয়াড়কে জড়িয়ে ধরে রইল। নিরুপায় রোমা দল তখন চেলসি দলের সঙ্গে জড়াজড়ি করেই মাঠে নামল।

আবার চলল আগের মত পাথর, ইট, ডিম, টমেটো, কাঁচের বোতল, গেলাস, মাটির ভাঁড়, পচা শাক-সব্জি বর্ষণ। বাজি আর পটকাও পড়তে লাগল। খেলার মাঠ ছোট হয়ে গেল নিজে থেকেই। কোন খেলোয়াড়ই আর লাইনের দিকে দাঁড়াতে রাজি নয়। সকলেই মাঠের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে। একটা ইটের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিণ্টন মাটিতে শুয়ে পড়লেন, সেই ইট লিওনার্দির মাথা ঘেঁসে চলে গেল। লিওনার্দির ভীষণ রাগ। হিণ্টনের জন্যেই তিনি আহত হতে বসেছিলেন, সুতরাং ছুটে গিয়ে হিণ্টনকে তিনি দুই ঘুসি কষিয়ে দিলেন।

রেফারি বাঁশি বাজালেন। ফাউল! রেফারি পড়লেন দারুণ মুস্কিলে —আইনানুযায়ী লিওনার্দিকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া উচিত, কিন্তু তার ফলে দর্শকেরা সমস্ত খেলোয়াড়কে খুন করে ফেলতে পারে। তবু আইন হল আইন।

রেফারি মনস্থির করে লিওনার্দির দিকে ধীর পায়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। দর্শকেরা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। কয়েকজন দর্শক স্টেডিয়াম থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। রেফারিকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল

পাথর, বোতল, উড়ন তুবড়ি, হাউই। চেলসির খেলোয়াড়েরা প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করেছেন।

রেফারি গম্ভীরভাবে এগিয়ে গিয়ে ফাউল কিকের জন্য বলটি বসিয়ে দিয়ে চলে এলেন—না তাকালেন লিওনার্দির দিকে, না তাকালেন হিন্টনের দিকে। মারমুখী দর্শক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সকলের এক মারাত্মক ফাঁড়া কেটে গেল। পলায়ন-রত চেলসির খেলোয়াড়েরা আবার মাঠে ফিরে এলেন।

এইভাবেই খেলা শেষ হল। ফল ড্র, কোন পক্ষই গোল করতে পারে নি।

খেলা-শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে দুই দলের খেলোয়াড়, রেফারি এবং লাইনসম্যান নিয়ে পঁচিশ জনের মধ্যে অলিম্পিকের একশো মিটার ফ্ল্যাট রেসের পাল্লা চলল। সকলেই প্রাণপণে দৌড়িয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল।

এখানেই কিন্তু জের মিটল না।

চেলসি দলকে নিয়ে যে তারা হাতের সুখ করতে পারে নি, সেই ক্ষোভ তাদের যায় নি। স্টেডিয়ামের বাইরে চল্লিশ হাজার মানুষ তাদের ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য চিৎকার করছে। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে যাওয়ায় তাদের সঙ্গে পুলিশের লেগেছে মারামারি। তারের জাল ফেলে তার মধ্য দিয়ে চেলসির খেলোয়াড়দের মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই জালের ওপর এসে পড়ছে ইট-পাটকেল।

সমস্ত-জানলা-বন্ধ একটা বাসে উঠল চেলসির খেলোয়াড়রা। স্টেডিয়ামের চারদিকের রাস্তা জুড়ে রক্তলোলুপ ইতালীয় দর্শক। বাসের ওপর ইট, পাথর, বোতল এসে পড়ছে। ড্রাইভার কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে খুব জোরে গাড়ি ছোটালো। এবারে পিস্তল গর্জে উঠল। বাসের কাঁচের জানলাগুলো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল।

প্রাণে বেঁচে দেশে ফিরে এল চেলসির খেলোয়াড়েরা। প্রথম লেগের খেলার ফলাফলে জয়লাভও করল।

কিন্তু রোম বিশেষ খুশি হল না। যতদূর মজা করা যাবে ভাবা

গিয়েছিল, তার কিছুই তারা করে উঠতে পারল না। অত্যন্ত বেরসিক ইংরেজরা! ধিক্!

পরের দিন একটি পত্রিকায় লেখা হল:

> রোমের জনসাধারণ আনন্দলাভের জন্য চেলসির খেলা দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু চেলসি রোমের জনসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করেছে।

অপর একটি পত্রিকা লিখল:

> ব্রিটিশের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করা বৃথা। সামান্যতম রসজ্ঞান তাদের নেই!

অখ্যাতের অখ্যাতি

অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দৌড়বীরদের স্বাস্থ্য, শক্তি, সহনশীলত স্থির বুদ্ধি এবং ক্ষিপ্রগতির চরম পরীক্ষা হয় ম্যারাথন রেসে—সাধার লোকের এই ধারণা। কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু তিন হাজার মিটা স্টীপলচেজ-এর দৌড়ও সেদিক দিয়ে কম নয়। তিন হাজার মিটার মা: এক মাইল এক হাজার পাঁচশ একুশ গজ। সাড়ে সাত ভাগে বা ল্যাপে এই দৌড়টি হয়। প্রত্যেক ল্যাপে থাকে পঁয়ত্রিশটি বাধা, চারটি বিরা কাঠের প্রাচীর বা বাধা এবং জল-কাদার ভিতর দিয়ে দৌড়োনো। সা: বার এই সমস্ত বাধা পার হয়ে দৌড়ের শেষ সীমানায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। এই দৌড়ের জন্য চাই দৈহিক এবং মানসিক বল এবং কষ্ট স্বীকারের অসাধারণ ক্ষমতা।

এই দৌড়ে তাই অত্যন্ত অভিজ্ঞ দৌড়বীর ছাড়া কারুর পক্ষে সাফল্যলাভ করা একরকম অসম্ভব। কিন্তু ১৯৫৬ সনের মেলবো: অলিম্পিকে প্রায়-অনভিজ্ঞ, অজ্ঞাত এবং অখ্যাতনামা এক প্রতিযোগী সকলকে বিস্মিত করে স্টীপলচেজ দৌড়ের ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। প্রতিযোগিতার সময়টুকু জুড়েই যে শুধু এই নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা নয়, প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিন ঘণ্টা ধরে সেই আশ্চর্য নাটকের জের চলে।

এই প্রতিযোগীর নাম ক্রিস্টোফার ব্রেশার।

ব্রেশারের জন্ম ব্রিটিশ গায়নায়। দৌড়ে ছিল নেশা, এবং প্রথমে একশো মিটার দৌড়েই তিনি প্রতিযোগিতা করতেন। একশো মিটারে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে না পেরে ১৯৫৪ সনে ইংল্যাণ্ডে স্টীপলচেজ প্রতিযোগিতাটাই বেছে নিলেন। কিন্তু তবু ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন হল না। ইংল্যাণ্ডের কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতাতেই তিনি প্রথম হতে

পারেন নি। ১৯৫৫ সনে জাতীয় প্রতিযোগিতায় জন ডিসলি হলেন প্রথম, ব্রেশার দ্বিতীয়।

১৯৫৬ সনে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। অলিম্পিকে ব্রিটিশ দলে মনোনীত হওয়ার জন্য তিনি প্রচুর অনুশীলন করতে লাগলেন। কিন্তু অলিম্পিক নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন এরিক শার্লি, দ্বিতীয় হলেন জন ডিসলি, তৃতীয় ক্রিস ব্রেশার। ওলিম্পিক দলে মনোনীত হলেন শার্লি এবং ডিসলি। ব্রেশারকে অতিরিক্ত দৌড়িয় হিসেবে মনোনীত করা হল—কোন কারণে শার্লি কিংবা ডিসলি দৌড়তে অপারগ হলে তাঁদের পরিবর্তে ব্রেশার ব্রিটেনের হয়ে দৌড়োবেন।

মেলবোর্ন অলিম্পিকে স্টীপলচেজ দৌড়ের প্রতিযোগীরা প্রত্যেকেই বিশেষ সুনামী। এসেছেন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গারির রজসনিওই, পূর্বতন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন রাশিয়ার রিমিশ্চিন, পোল্যাণ্ডের উদীয়মান জার্জি ক্রামিক, নরওয়ের আর্নস্ট লারসেন, ব্রিটেনের বর্তমান শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর এরিক শার্লি এবং হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের তৃতীয় স্থান অধিকারী ব্রিটেনের জন ডিসলি। এই বিশ্ববিখ্যাত স্টীপলচেজের দৌড়বীরদের মাঝে ব্রেশারের অবস্থা ঠিক হাঁসের দলে বকের মত।

১৯৫৬ সনের ২৯শে নভেম্বর।

ব্রিটেনের টীম ম্যানেজার জ্যাক ক্রাম্পের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন ব্রেশার। সেইদিনই তিন হাজার মিটার স্টীপলচেজ দৌড়। ব্রেশার ক্রাম্পকে অনুনয় করলেন যেন তৃতীয় ব্রিটিশ প্রতিযোগী হিসেবে তাঁকে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হয়, নয় তো জীবনে তিনি আর কখনও অলিম্পিকে দৌড়োনোর সৌভাগ্য লাভ করবেন না। ব্রেশারের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রাম্প সম্মত হলেন।

বেলা চারটের সময় শুরু হল স্টীপলচেজ দৌড়। পঁচাশি হাজার দর্শক দেখছে এই কঠিন প্রতিযোগিতা। প্রথম ল্যাপেই প্রতিযোগিরা ছড়িয়ে পড়লেন। সকলের আগে ছুটে চলেছেন রজসনিওই, রিঝিশ্চিন, লারসেন, শার্লি, ক্রোমিক এবং ডিসলি। প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ, প্রত্যেকেই কৌশলী। এই দলের মধ্য থেকেই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হবে বলে

দর্শকমহলের ধারণা। কে জয়লাভ করবেন—শুধু এই নিয়েই দর্শকমহলে আলোচনা এবং উত্তেজনা। ব্রেশার তখনও পিছনের দলে, কিন্তু সমানে দৌড়ে এক একটি বাধা ডিঙিয়ে চলেছেন।

দৌড়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সুনামী দল নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা করে চলেছে। চার ল্যাপের মাথায় ব্রেশার পিছনের দল ছেড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখনও পর্যন্ত দর্শকের দৃষ্টি পড়ে নি এই নবাগতের দিকে। এ ধরনের দৌড়ে এক একজন অতর্কিতে এগিয়ে যায় কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারে না—হয় পিছিয়ে যায়, নয় তো সে বসে পড়ে।

এবারে দৌড়িয়েদের মধ্যে ক্লান্তি দেখা গেল ; কয়েকজন দৌড় থেকে বিদায় নিলেন, কয়েক জন পিছিয়ে পড়লেন। ব্রিটেনের ডিসলি বসে পড়লেন। রিঝিশ্চিন পিছিয়ে পড়লেন, কিন্তু ব্রিটেনের তিন নম্বর প্রতিযোগী ক্রিস ব্রেশার ছুটে চলেছেন—এতটুকু ক্লান্তি নেই।

পঞ্চম ল্যাপে যখন তিনি অতি সহজেই হার্ডল্‌স্ পার হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে জলা জায়গা পার হলেন, তখন পঁচাশি হাজার দর্শকের দৃষ্টি পড়ল ব্রেশারের ওপর। ব্রিটেনের চ্যাম্পিয়ন শার্লিকে পিছনে ফেলে ব্রেশার এগিয়ে এসেছেন।—ব্রেশার! ব্রেশার! সকলে চিৎকার করে তাঁকে বাহবা দিতে লাগল।

আর মাত্র দুটি ল্যাপ বাকি। ব্রেশার দৌড়ের গতি বাড়িয়ে সকলকে অতিক্রম করে তৃতীয় স্থানে উপস্থিত হলেন। সকলের আগে লারসেন, তারপর রজসনিওই। শেষ ল্যাপের ঘণ্টা বাজার সময়েও এই তিনজন একই অবস্থায় রইলেন।

দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। শেষ ল্যাপের প্রথম বাঁকেই ব্রেশার গতি বাড়িয়ে লারসেন ও রজসনিওইর সঙ্গে এক লাইনে এলেন। ঠিক একই সঙ্গে এই তিনজন হার্ডল্‌স্ লাফালেন, মাটিতে পড়লেন এবং দৌড়তে লাগলেন। এইবার সর্বশক্তি দিয়ে ব্রেশার অন্য দুই প্রতিযোগীকে অতিক্রম করে প্রথম স্থান নিলেন। ছুটে গিয়ে শেষ বারের মত জলে ঝাঁপ দিলেন এবং সেই জল অতিক্রম করে মাটিতে উঠে প্রাণপণে দৌড়িয়ে প্রথম সুতো ছিঁড়লেন।

সকলে ঘিরে ধরল তাঁকে, কিন্তু তখন তাঁর মাথা ঘুরছে, পা টলছে—সেইখানেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

একটু পরেই জ্ঞান হল। দ্বিতীয় হয়েছেন লারসেন, তৃতীয় রজসনিওই। তিন জনই ভিক্টরি স্ট্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, এমন সময়ে লাউড স্পীকারে শোনা গেল :

আম্পায়ারের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্টীপলচেজ দৌড়ের ফলাফল ঘোষণা মুলতুবি রাখা হল।

এই চাঞ্চল্যকর ঘোষণায় সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

আবার ঘোষণা হল :

শেষ ল্যাপে এক প্রতিযোগীকে বাধা দেওয়ার জন্য ব্রেশারকে ডিস-কোয়ালিফাই করা হয়েছে।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন ব্রেশার। এত পরিশ্রম, এত প্রচেষ্টার পর প্রথম হয়েও মিথ্যা অভিযোগে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবেন। ব্রিটেনের টিম ম্যানেজার ক্রাম্প এই আদেশ মানতে রাজি হলেন না। চব্বিশ বছর পরে এই দৌড়ে ব্রিটেনের এই প্রথম স্বর্ণপদক লাভ। মিথ্যা অভিযোগে এই গৌরব তিনি হারাতে দেবেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান-সমিতি আহ্বান করলেন।

অনুসন্ধান-সমিতি বসল।

শেষ ল্যাপের হার্ডল্‌সের কাছে দাঁড়ানো অলিম্পিক কমিটির এক কর্মচারী বললেন যে ব্রেশার হার্ডল্‌স্‌ লাফানোর সময় লারসেনকে বাধা দিয়েছেন। আম্পায়ার এই কর্মচারীর অভিযোগ মেনে নিয়ে ব্রেশারকে প্যাচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ব্রেশারকে ডেকে প্রশ্ন করা হল। ব্রেশার এই অভিযোগ সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে কাউকে তিনি বাধা দেন নি।

লারসেনকে ডাকা হল। লারসেন অভিযোগের মর্ম শুনে আশ্চর্য হলেন। জানালেন যে তাঁকে কেউ বাধা দেয়নি, ব্রেশার তো নয়ই।

ব্রেশার নিজ গুণে প্রথম হয়েছেন। এখন তাঁকে প্রথম ঘোষণা না করলে অন্যায় করা হবে।

অনুসন্ধান-সমিতির সভা চলল তিন ঘণ্টা ধরে। ইতিমধ্যে সেদিনকার মত সমস্ত শেষ হয়ে গেছে, মাঠের মধ্যে অন্ধকারে শুধু বসে আছেন স্টীপলচেজের প্রতিযোগীরা।

তিন ঘণ্টা পরে হাসি মুখে ছুটে এলেন জ্যাক ক্রাপ। তারপরেই অনুসন্ধান-সমিতি ঘোষণা করলেন যে ক্রিস্টোফার ব্রেশার স্টীপলচেজ দৌড়ে প্রথম হয়েছেন। সময় লেগেছে ৮ মিনিট ৪১'২ সেকেণ্ড—অলিম্পিক রেকর্ড।

পরদিন সকালবেলায় ভিক্টরি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালেন ব্রেশার, লারসেন এবং রজসনিওই। স্বর্ণপদক গলায় পরে কেঁদে ফেললেন ব্রেশার, তাঁকে কাঁধে করে ড্রেসিং রুমে নিয়ে এলেন লারসেন ও রজসনিওই।

দর্শকেরা অভিনন্দন জানালেন তিনজনকেই—শুধু তাঁদের সাফল্যের জন্য নয়, তাঁদের প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির জন্যেও।

একমেব অদ্বিতীয়ম

পৃথিবীতে ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচে আশ্চর্য-সুন্দর খেলা, চমৎকার চিত্তাকর্ষক খেলা কিংবা তুমুল উত্তেজনামূলক খেলার সংখ্যা কম নয়, কিন্তু মাত্র একটি টেস্ট ম্যাচ আজ পর্যন্ত শুধু 'টাই' হয়ে ড্র হয়েছে। 'টাই' অর্থাৎ দুই দলের দুই ইনিংসের মোট রান-সংখ্যা যোগ করে একেবারে সমান-সমান। ক্রিকেট ম্যাচ ড্র হয় এবং প্রায়ই হয়ে থাকে, কিন্তু এভাবে খেলার মীমাংসা বড় ম্যাচে আজ পর্যন্ত শুধু একটিবারই হতে পেরেছে।

সেটি সম্ভব হয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৬০-৬১ সনের অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম টেস্ট খেলায় ব্রিসবেনে।

স্মরণের ইতিহাসে এত উত্তেজনামূলক, এত আনন্দদায়ক এবং এত দর্শকমুগ্ধকর ক্রিকেট খেলা আর দেখা যায় নি। এই ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচের স্মৃতি প্রতিটি খেলোয়াড় এবং প্রতিটি দর্শকের মনে সারা জীবন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলে বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় মাঝে-মাঝেই দেখা দিয়েছেন। জর্জ হেডলি, লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন কিংবা উইকস্, ওরেল, ওয়ালকটের নাম জানেন না—এমন লোক বিরল। তবু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ক্রিকেট টীম হিসেবে সুখ্যাত ছিল না। দলের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার এবং টেস্ট ম্যাচ খেলার মনোভাবের অভাবই ছিল তার একমাত্র কারণ।

১৯৬০-৬১ সনের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় তরুণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে সুসংবদ্ধ করে একটি বিশ্বজয়ী দলে পরিণত করার গুরুভার অর্পিত হয় ওরেলের ওপর। ওরেল তখন আর তরুণ নন, সমস্ত-বোলারকে-তুচ্ছ-করা ব্যাটিং-এর দ্যুতিও আর নেই, কিন্তু তখন তিনি অভিজ্ঞ এবং স্থিতধী।

কিন্তু এই তরুণ এবং অনভিজ্ঞ দল নিয়ে ওরেল অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম দিকে বিশেষ সুবিধার কিছু করে উঠতে পারলেন না। অস্ট্রেলিয়ার

গৌরব-সূর্য তখন মধ্য গগনে। ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছয়টি প্রথম শ্রেণীর খেলা খেলেছে, কিন্তু মাত্র একটিতে জয়লাভ করেছে। টেস্ট ম্যাচ খেলার ঠিক আগের খেলাতে নিউ সাউথ ওয়েল্‌সের কাছে তারা পরাজিত হয়েছিল এক ইনিংস এবং ১১৯ রানে।

সুতরাং আশ্চর্যের নয় যে অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে টেস্ট ম্যাচ খেলার যোগ্য একটি দল বলে মনে করবে না। ফলে ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা দেখার জন্য দর্শকদের এতটুকু আগ্রহ দেখা গেল না। প্রথম টেস্ট ম্যাচ পর্যন্ত প্রতিটি খেলাই ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লোকসান।

কিন্তু এই টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত পরিস্থিতি একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। প্রতিটি খেলাতেই দর্শকদের খেলা দেখার জন্য লাইন। বাকি চারটি টেস্ট ম্যাচে সাড়ে সাত লক্ষ লোক খেলা দেখতে এসেছিল। মেলবোর্নে এক দিন নব্বই হাজার আটশো লোক খেলা দেখতে এসেছিল—ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই দর্শক-সংখ্যা আজও পর্যন্ত রেকর্ড হয়ে আছে।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল টসে জয়লাভ করে ব্যাট করা স্থির করলেন। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম তিনটে উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৬৫ রানে। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন রিচি বেনো উল্লসিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবে না, অতি সহজেই জয়লাভ হবে।

কিন্তু চতুর্থ উইকেট পড়ল গিয়ে ২৩৯ রানে এবং অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সব-কটি উইকেট দখল করতে পারল ৪৫৩ রানের বিনিময়ে। গারফীল্ড সোবার্স করলেন ১৩২ রান।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সহজ পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে এখন সুদৃঢ় আসনে এসে বসেছে। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে অল্প রানে আউট করতে পারলে এই টেস্ট ম্যাচে তাদের বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। অস্ট্রেলিয়ারই এখন পরাজয়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা।

অস্ট্রেলিয়া দলের এই বিপদে ত্রাণকর্তা হয়ে এলেন নর্ম্যান ও'নীল। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের মোট ৫০৫ রানের মধ্যে তিনি একাই করলেন ১৮১ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাত থেকে প্রাধান্য সরে যেতে লাগল। তাড়াতাড়ি রান তুলে চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে দিয়ে সহজে আউট করার সিদ্ধান্ত নিলেন ওরেল। তার ফলে দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র ২৮৪ রান করে আউট হয়ে গেল। অ্যালান ডেভিডসন ৮৭ রানে ছয় উইকেট পেলেন।

শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া অবশ্যম্ভাবী জয়ের মনোভাব নিয়ে মাঠে নামল। সারা দিনে মাত্র ২৩৩ রান করতে পারলেই তাদের জয়, ঘণ্টায় মাত্র ৪৫ রান দরকার। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই রান করা মোটেই কঠিন নয়। তাদের দলে আছেন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান সিম্পসন, ম্যাকডোনাল্ড, হার্ভে, ও'নীল, ফ্যাভেল এবং ম্যাক্‌কে। এই ছয় জন ব্যাটসম্যানকে বাদ দিলে ডেভিডসন এবং গ্রাউটও মন্দ ব্যাট করেন না।

অস্ট্রেলিয়ান দর্শকদল এই সহজ জয়ের উত্তেজনাহীন খেলা দেখতে মাঠে ভিড় করল না। শেষ দিনের খেলায় মাঠে চার হাজার জন দর্শকও নেই। কিন্তু কত বড় ভুল তারা করেছিল! একটির পর একটি রোমাঞ্চক, উত্তেজনাকর ঘটনা সঙ্ঘটিত হতে লাগল।

অস্ট্রেলিয়া-দলের রান যখন ১ তখন শূন্য রানে সিম্পসন ওয়েলস হলের বলে আউট হয়ে গেলেন। নীল হার্ভেও ৫ রান করার পর সেই দুর্বার-গতি হলের বলে আউট হলেন। অস্ট্রেলিয়ার তখন ২ উইকেটে মাত্র ৭ রান। অস্ট্রেলিয়ার ৪৯ রানে মাথায় দুটি উইকেট পড়ল ও ১৬ রান করে আউট হলেন কলিন ম্যাকডোনাল্ড এবং ২৬ রান করে ও'নীল। মিছিল শুরু হয়ে গেছে। হলের বলের চতুর্থ বলি হলেন লেস্‌ ফ্যাভেল মাত্র ৭ রান করে। পাঁচ উইকেটে ৫৭ রান।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। এবার তাদের জয় আর আটকায় কে। কেন্‌ ম্যাক্‌কে খেলতে নামলেন—এই উইকেট পতনের মিছিল রোধ করতেই হবে। এ ধরনের দুর্যোগে বহুবার তিনি দলকে রক্ষা করলেও এবারে কিন্তু পারলেন না। মাত্র ২৬ রান করার পর

সোনি রামাধীন তাঁকে একেবারে বোল্ড আউট করে দিলেন। ৯২ রানে ৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া দলের জয়লাভ এখন সুদূরপরাহত, এবার শুধু পরাজয় এড়ানোর চেষ্টা।

ডেভিডসন আর বেনো এই বিপদে একত্রিত হলেন। তাঁরাই এখন অস্ট্রেলিয়া দলের শেষ ভরসা। দেখে শুনে তাঁরা স্থিরমস্তিষ্কে এবং অত্যন্ত আত্মনির্ভরতার সঙ্গে ব্যাট করতে লাগলেন। কিন্তু সময় চলে যায়, জয়লাভও হাতের মুঠোর বাইরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং মাঝে-মাঝে মারমুখী হয়ে উঠতে হচ্ছে। তাঁদের জুটিতে রান তখন ১৩৪, অস্ট্রেলিয়া দলের মোট রান-সংখ্যা ২২৬। জয়লাভের জন্য মাত্র ৭ রান এবং ১২ মিনিট বাকি।

প্রতিটি মিনিট এখন মহামূল্য মনে করে ডেভিডসন অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে একটা অতিরিক্ত রান নিতে গিয়ে রান আউট হয়ে গেলেন। ২৫ গজ দূর থেকে সলোমন বল ছুঁড়ে উইকেট ভেঙে দিলেন।

অস্ট্রেলিয়া দলের আর ৬ রান প্রয়োজন, হাতে তিনটি উইকেট।

দিনের শেষ ওভার খেলা শুরু হল। ওয়েস হল বল দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হলের প্রথম বলটা গ্রাউটের পায়ে এসে লাগল। বলটা ছিটকিয়ে যাওয়া-মাত্র তাঁরা একটা রান নিয়ে নিলেন। বেনো হলের বলের মুখোমুখি হলেন। হলের দ্বিতীয় বলে তিনি সহজে কট আউট হলেন।

ইয়ান মেকিফ এলেন। সমস্ত মাঠ থমথম করছে। হলের পর-পর দুটো কামানের গোলা তিনি চোখ বন্ধ করে আটকালেন।

জয়লাভের জন্য আর ৩ রান এবং তিনটি বল বাকি। গ্রাউট পরের বলটা মিড-উইকেটের দিকে উঁচু করে মারলেন। মাঠের চারদিক থেকে খেলোয়াড়েরা সেই ক্যাচ ধরার জন্য ছুটে এলেন। বলটা হলের আঙুলে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। গ্রাউট এক রান করলেন।

জয়লাভের জন্য আর ৩ রান এবং ২টি বল বাকি। হলের পরের বলটি মেকিফ সজোরে লেগের দিকে মারলেন। মেকিফ আর গ্রাউট ২ রান নিলেন এবং জয়লাভের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে আর একটা রান নিতে গেলেন; কিন্তু গ্রাউট রান আউট হয়ে গেলেন।

অস্ট্রেলিয়া দলের ৯ উইকেটে ২৩২ রান। জয়লাভের জন্য আর ২ রান, ১টি বল বাকি। ক্লাইন ব্যাট করতে নামলেন। তিনি হলের বলটি সলোমনের দিকে মেরেই জয়লাভের জন্য রান নিতে গেলেন। কিন্তু সলোমন তাঁদের তুলনায় যেন অনেক বেশি ক্ষিপ্রগতি এবং অব্যর্থ-লক্ষ্য ছিলেন। তিনটে উইকেটই তাঁর সঙ্গে এক সরল রেখায়, কিন্তু সেই অবস্থা থেকেও বল ছুঁড়ে তিনি উইকেটে মারলেন। মেকিফ ক্রীজে এসে পৌঁছুলেন কয়েক সেকেণ্ড পরে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েরা আনন্দে মাঠে নাচতে শুরু করে দিল। দর্শকেরা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে লাগল। এ ধরনের খেলা এর আগে আর কেউ দেখেনি। তারপর সকলেরই মনে এক প্রশ্ন : খেলার ফলাফল কী? ড্র?

সন্দেহের নিরসন হল। ড্র, এবং টাই-ড্র। দু-দলই মোট ৭৩৭ রান করেছে।

ব্রিসবেনের এই টেস্ট ম্যাচ ছাড়াও আর দুটি টেস্ট ম্যাচের কথা মনে পড়ে যায়, যার শেষ মুহূর্তের উত্তেজনা ওই টেস্টের চেয়ে খুব কম হয় নি, যদিও ফলাফল অতটা চমকপ্রদ হতে পারে নি। সেই দুটো টেস্ট ম্যাচেরও অংশীদার ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। প্রথমবার ১৯৬৩ সনে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে, যখন ওরেল তরুণ খেলোয়াড়দের সংহত করে বিশ্বজয়ী ক্রিকেট-দলে পরিণত করছেন। এর পরেই তিনি সোবার্সের হাতে সেই দল ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার ১৯৬৯ সনে অস্ট্রেলিয়ায়, সোবার্সের বিশ্বজয়ী দলের যখন গৌরব-সূর্য অস্তগামী।

১৯৬৩ সনের লর্ডস মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ।

ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ডকে নির্মমভাবে দশ উইকেটে পরাজিত করেছে। প্রথম ইনিংসে তারা করেছিল ৬

উইকেটে ৫০১ রান। হান্ট করেছিলেন ১৮২, কানহাই ৯০, সোবার্স ৬৪ এবং ওরেল ৭৪ নট আউট। ইংল্যাণ্ড করেছিল প্রথম ইনিংসে ২০৫, ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯৬ রান। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রথম ইনিংসে ডেক্সটার করেন ৭৩ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে স্টুয়ার্ট ৮৭ রান। দুই ইনিংস মিলিয়ে গিবস ১৫৭ রানে ১১টা উইকেট দখল করেন।

২০শে জুন বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা শুরু হল। ওরেল টসে জিতে ব্যাটিং নিলেন। আবহাওয়া খুব ভাল নয়, আকাশে মেঘ করে আছে। ডেক্সটার ফাস্ট বোলারের ওপর বেশি নির্ভর করছেন। প্রথম দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬ উইকেটে ২৫৪ রান করল, তার মধ্যে হান্ট করলেন ৪৪, সোবার্স ৪২, কানহাই ৭৩।

পরের দিন সকালে ৩০১ রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হল। সলোমন করলেন ৫৬, মারে ২০ এবং হল ২৫ নট আউট। ট্রুম্যান ১০০ রানে ৬ উইকেট পেলেন, শ্যাকলটন পেলেন ৯৩ রানে ৩ উইকেট।

ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংস শুরু করল। মাত্র ২ রানে প্রথম দুটি উইকেট পড়ে গেল। গ্রিফিথ নিলেন সেই দুটো উইকেট। এই সময় এলেন ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন। ডেক্সটার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বোলিংকে তাচ্ছিল্য করে খেলে যেতে লাগলেন, ব্যারিংটন রইলেন উইকেট আটকিয়ে। দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড সাত উইকেটে ২৪৭ রান করল। ডেক্সটার ৭০, ব্যারিংটন ৮০ এবং পার্কস করলেন ৩৫।

তৃতীয় দিনে টিটমাস ইংল্যাণ্ডকে একেবারে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল ২৯৭ রানে। টিটমাস ৫২ রান করে নট আউট রইলেন। গ্রিফিথ পেলেন ৯১ রানে ৫ উইকেট, ওরেল ১২ রানে ২ উইকেট।

সেই দিনের দুপুরবেলায় ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের অত্যন্ত দুরবস্থা। দ্বিতীয় ইনিংসে তারা ৫ উইকেটে করেছে মাত্র ১০৪ রান। হান্ট, ম্যাকমরিস, সোবার্স, কানহাই আর সলোমন সামান্য রানে আউট হয়ে গেছেন। ব্যাট করতে নামলেন বুচার আর ওরেল। প্রবীণ ওরেল স্থির মস্তিষ্কে

খেলে যেতে লাগলেন, তরুণ বুচারকে ব্যাট চালাতে দিলেন। ৫ উইকেটে ১০৪ রান থেকে দিনের খেলা শেষ হল ৫ উইকেটে ২১৪ রানে।

রবিবার খেলা বন্ধ। সোমবার আবার খেলা শুরু হল। টু্ৰ্যানের প্রথম ওভারেই ওরেল শর্ট লেগে কট আউট হয়ে গেলেন ৩৩ রান করে। টু্ৰ্যান আর শ্যাকলটন আবার একটার পর একটা উইকেট নিতে লাগলেন। বুচার ১৩৩ রান করে আউট হয়ে গেলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল ২২৯ রানে। টু্ৰ্যান ৫২ রানে ৫ উইকেট এবং শ্যাকলটন ৩৪ রানে ৪ উইকেট পেলেন।

২৩৪ রান করতে পারলে ইংল্যাণ্ড জয়ী হবে।

হল ঝড়ের গতিতে বল করতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ডের তিনটি উইকেট পড়ে গেল ৩১ রানে। ব্যারিংটন আর কাউড্রে এই পতন রোধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন. ইংল্যাণ্ড দলের মোট ৭২ রানের মাথায় হলের একটি খাটো লেংথের বল সজোরে এসে লাগল কাউড্রের কব্জিতে। একটা হাড় ভেঙে গেল। আহত হয়ে অবসর গ্রহণ করলেন কাউড্রে। ইংল্যাণ্ডের চরম দুর্দিন। তিন উইকেটে ১১৬ রান করে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হল।

মঙ্গলবার খেলার শেষ দিন। বৃষ্টির জন্য সকাল থেকে খেলা বন্ধ। শেষ পর্যন্ত দুটো বেজে কুড়ি মিনিটে খেলা শুরু হল। তখনও ২০০ মিনিটে ১১৮ রান করতে পারলে ইংল্যাণ্ড জয়ী হবে। ব্যারিংটন ৬০ রান করে আউট হয়ে গেলেন। তখন ইংল্যাণ্ডের ৪ উইকেটে ১৩০ রান।

এবার এলেন ক্লোজ। এতদিন কোন টেস্ট ম্যাচে তিনি ভাল খেলতে পারেন নি। আর একদিকে পার্কস সুন্দর মেরে খেলতে খেলতে ১৭ রান করে আউট হলেন। ১৫৮ রানে ৫ উইকেট। এলেন টিটমাস। চা-পান পর্ব পর্যন্ত দুজনে টিকে রইলেন।

দুজনে মিলে শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের মোট রান ২১৩-এ নিয়ে গেলেন। জয়ী হতে হলে ইংল্যাণ্ডের আর মাত্র ২১ রান প্রয়োজন। হাতে আছে চারটি উইকেট এবং প্রয়োজন হলে কাউড্রে। ঠিক এই সময় হলের বলে টিটমাস ম্যাকমরিসের হাতে কট আউট হলেন। ২১৩ রানে ৬ উইকেট।

ট্রুম্যান নেমেই হলের বল জোরে মারতে গেলেন। উইকেটকীপার মারে লাফিয়ে উঠে ক্যাচ লুফে নিলেন। ইংল্যাণ্ড ৭ উইকেটে ২১৩ রাণ।

আর ৪৫ মিনিট বাকি। ক্লোজ অ্যালেনকে আড়াল করে খেলতে লাগলেন, কিন্তু গ্রিফিথের বলে জোরে মারতে গিয়ে তিনি ৭১ রান করে আউট হয়ে গেলেন। ৮ উইকেটে ২১৯ রান। ইংল্যাণ্ডের জয়ী হতে হলে আরো পনের রানের প্রয়োজন, বাকি মাত্র উনিশ মিনিট। শ্যাকলটন আর অ্যালেন কয়েকটা রান করে নিলেন।

শুরু হল শেষ ওভারের খেলা। হল বল দিতে শুরু করলেন। তখন জয়লাভ করতে আরও আট রান দরকার। দ্বিতীয় বলে শ্যাকলটন এক রান করলেন, তৃতীয় বলে অ্যালেন করলেন এক রান। চতুর্থ বলটি শ্যাকলটন লেগের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অ্যালেন বিদ্যুতের গতিতে রান নেবার জন্য ছুটে এলেন। শ্যাকলটন হঠাৎ দেখলেন যে অ্যালেন তাঁর দিকে ছুটে আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও রান নেবার জন্য দৌড়োতে লাগলেন। এদিকে ওরেল ছুটে গিয়ে বল ধরেছেন। ওখান থেকে বোলারের দিকে বল ছুঁড়তে তাঁর সাহস হল না। তিনি বল হাতে নিয়েই উইকেটের দিকে ছুটতে লাগলেন। দুই প্রবীণ খেলোয়াড় শ্যাকলটন আর ওরেলের যেন দুটি অলিম্পিক একশো মিটারের দৌড়। দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে ওরেল বল দিয়ে উইকেট ভেঙে দিলেন। শ্যাকলটন হলেন রান আউট। ইংল্যাণ্ড ৯ উইকেটে ২২৮ রান।

আর ছয় রান করতে পারলে জয়ী হবে, বাকি মাত্র দুটি বল এবং হাত-ভাঙা কাউড্রে। প্লাস্টার-করা হাত নিয়ে বাঁ হাতে ব্যাট ধরে নামলেন কাউড্রে। হাত-ভাঙা কাউড্রেকে ব্যাট করতে হবে মনে করে হল বল মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। অ্যালেনকে ব্যাট করতে দেখে আবার বল তুলে নিলেন হল। অ্যালেন আর কাউড্রে পিচের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করলেন—জয়ের চেষ্টা করা হবে কি না। কাউড্রে ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন না। শেষ দুটি বল অ্যালেন কোনরকমে প্রতিহত করলেন। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২২৮ রান উঠল। হল ৯৩ রানে ৪টি উইকেট এবং গ্রিফিথ ৫৯ রানে ৩টি উইকেট দখল করলেন।

খেলার ফলাফল ড্র।

১৯৬১ সনের ২৪শে জানুয়ারি এডিলেডের ওভাল মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট। এই পর্যায়ের খেলায় এই টেস্ট ম্যাচটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতে স্যর ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ট্রোফি। অস্ট্রেলিয়া ২-১ টেস্টে অগ্রসর হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়া এই টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করলেই ট্রোফি লাভ করবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যদি এই টেস্টে জয়লাভ করে এবং শেষ টেস্ট ম্যাচে ড্র করে তবে তাদের হাতেই ট্রোফি থেকে যাবে। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্টে জিতলেও পর-পর দুটি টেস্টে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেই বিশ্বজয়ী দল আর নেই। দলের সকলেরই বয়স হয়েছে, খেলার নৈপুণ্য আর তেমন নেই। অস্ট্রেলিয়ার তরুণ দল এখন দুর্ধর্ষ।

টসে জিতে সোবার্স ব্যাটিং করা স্থির করলেন; কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ব্যাটিং-এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না। মাত্র ২৭৬ রানে সকলে আউট হয়ে গেল, একমাত্র সোবার্স করলেন সেঞ্চুরি। বেনোলি অধিকাংশ উইকেট দখল করলেন। দিনের শেষে একটিও উইকেট না হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া করল ৩৭ রান।

পরের দিন অস্ট্রেলিয়া ৩৬১ মিনিটে আরও ৩৬৭ রান যোগ করল মাত্র ৬ উইকেটে। সকলেই সুন্দর ব্যাট করলেন। লরি ৬২, স্টাকপোল ৬২, চ্যাপেল ৭৬, রেডপাথ ৪৫, শীহান ৫১ এবং ফ্রীম্যান করলেন ৩১। ওয়াল্টার্স ৮৫ রান করে নট আউট। সকলেরই ধারণা অস্ট্রেলিয়া আবার এই টেস্ট ম্যাচটিতেও সহজে জয়ী হবে।

তৃতীয় দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া সব উইকেট হারিয়ে ৫৩৩ রান করল। ওয়াল্টার্স করলেন সেঞ্চুরি, ১১০ রান। ম্যাকেঞ্জি করলেন ৫৯ রান। গিবস ১৪৫ রানে দখল করলেন ৪টি উইকেট।

২৫৭ রানে পিছিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল। এই টেস্টে তাদের পরাজয় একরকম অনিবার্য। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মরণ-পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। প্রত্যেকেই সুন্দর খেলা খেলে গেলেন।

ক্যারু করলেন ৯০, কানহাই ৮০। কানহাই মেরেছিলেন দশটা বাউণ্ডারি এবং একটা ওভার-বাউণ্ডারি। বুচার ৪৪ নট আউট।

এই আশ্চর্য খেলা চলল চতুর্থ দিনেও। বুচার সেঞ্চুরি করলেন—১১৮, নার্স করলেন ৪০, সোবার্স ৫২, লয়েড ৪২, হলফোর্ড ৮৯, হেণ্ড্রিকস্ নট আউট ৩৬। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নয় উইকেটে ৬১৪ রান।

খেলার শেষ দিনে মাত্র দুই রান যোগ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৬১৬ রানে সকলে আউট হয়ে গেল। এই ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দুটি রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করল। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তারা এক ইনিংসে এত বেশি রান আর করে নি। ১৯৬৫ সনে বারবাডোজের টেস্টে ৫৭৩ রানই এতদিন তাদের সর্বোচ্চ রান ছিল। নবম উইকেটের জুটিতে হলফোর্ড এবং হেণ্ড্রিকসের ১২২ রান অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় রেকর্ড। পূর্বের রেকর্ড ছিল ম্যাককে এবং মার্টিনের ৯৭ রান।

৩৫৯ রানে পিছিয়ে থেকে অস্ট্রেলিয়া তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল। ৩৬০ রান করলে এই টেস্টে তারা জয়ী হবে এবং শেষ এক ঘণ্টার খেলা আবার সেই ১৯৬০-৬১ সনের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার 'টাই' টেস্ট ম্যাচের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

এক ঘণ্টা আগে পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা বেশ ভালই ছিল। ৬২ রান করতে পারলে জয়ী, হাতে তখনও সাতটা উইকেট। ইতিপূর্বে লরি ৮৯, স্ট্যাকপোল ৫১ এবং চ্যাপেল ৯৬ রান করে আউট হয়েছেন। চতুর্থ উইকেট পড়ল ৩০৪ রানে। তারপর ওয়াল্টার্স ৫০ রান করে রান আউট হলেন। পাঁচ উইকেটে ৩১৫। ফ্রীম্যান রান আউট হলেন ১ রান করে। ছয় উইকেটে ৩১৮। জারমান রান আউট হলেন ৪ রান করে। সাত উইকেটে ৩২২ রান।

এবারে ম্যাকেঞ্জি এলেন। শীহান আর ম্যাকেঞ্জি ব্যাট তুলতে আর চান না। তখন আর ৪.৫ ওভার বাকি। গিবসের বলে ম্যাকেঞ্জি প্রবল জোরে বল ঘোরালেন। ফাইন লেগে পরিবর্ত খেলোয়াড় ক্যামাচো সেই ক্যাচ ধরলেন। ৩৩৩ রান আট উইকেটে।

৩.২ ওভার যখন বাকি গ্রিফিথ গ্লীসনকে এল. বি. ডব্লু. করলেন।

৩৩৩ রানে নয় উইকেট। শেষ খেলোয়াড় কনোলি ব্যাট হাতে নামলেন। তখনও পঁচিশটি বল বাকি। সেই ওভারের একটা বল আটকালেন কনোলি। পরের ওভার শীহান ঘাড় গুঁজে খেলে গেলেন।

মাত্র দু-ওভার বাকি। এবার সোবার্স নতুন বল নিলেন। সোবার্সের মুখোমুখি কনোলি। দর্শকেরা সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পুরো আটটা বলের ওভার কনোলি খেললেন। শেষ দু-বলে তিনি ছয় রানও করলেন। একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

এবারে গ্রিফিথ বল দিচ্ছেন, শেষ ওভার। মাথা নিচু করে শীহান একটির পরে একটি বল আটকিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকদল উত্তেজনায় মাঠের মধ্যে নেমে এসেছে। ওভারের সপ্তম বলটি শীহান একটু জোরে মারলেন, এক রান সহজেই নেওয়া যায়। কনোলি রানের জন্য ডাক দিলেন, কিন্তু শীহান ক্রীজ ছাড়লেন না। শেষ বলে কনোলির আউট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি তিনি নেবেন না।

খেলা ড্র হয়ে গেল।

সমুদ্রের স্বাদ

ছেলেবেলা থেকেই সমুদ্রের ওপর দুর্বার আকর্ষণ।

আর্জেন্টিনার সমুদ্র-বায়ু-বিক্ষুব্ধ ঢেউ ভেঙে পড়ে, তাই নিয়ে কেটে যেত বালক আন্তনিও আবোর্তোন্দোর সারা বেলা। সমুদ্রের অগাধ ভালবাসা, তরঙ্গের উচ্ছল আবেগ, দিগন্তনীল অবাধ মুক্ত আকাশ আর রৌদ্রস্নাত বাতাসের দুর্জয় স্বাধীনতা, তাঁকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল।

সারা ছেলেবেলা তাঁর কেটেছিল এই সমুদ্রতীরে, এই সমুদ্রজলে, উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে সাঁতার কেটে। ভেবেছিলেন হয়ত সারা জীবনই কেটে যাবে এই আনন্দ-নির্ঝরে।

কিন্তু তার পর নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন হতে হল তাঁকে। এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন তিনি। সংসার-সমুদ্রে গা ভাসিয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হল। মন থেকে হারিয়ে গেল শৈশবের সেই স্বপ্নিল শ্যামল-নীল সমুদ্র। শুধু তার স্বাদ মাঝে-মাঝে অনুভব করতেন তিনি, উন্মন হয়ে উঠতেন।

যখন হাঁফ ছেড়ে আবার সেই সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়াবার সময় পেলেন, তখন তাঁর বয়স বেয়াল্লিশ বছর। সমুদ্রের জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে সাঁতার কাটতে কাটতে মনে হল—এই সমুদ্র ভেদ করে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাওয়া কি অসম্ভব?

সেইদিনই খবরের কাগজে দেখলেন যে একদল সাঁতারু ইংল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হয়েছেন ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হতে। শৈশবের সমুদ্র-আহ্বান আবার আন্তোনিও আবোর্তোন্দোর রক্ত-কণিকায় উদ্বেল হয়ে উঠল। এই সুদীর্ঘ সমুদ্র-সন্তরণের পক্ষে তাঁর বয়স একটু বেশি; কিন্তু সমুদ্রের স্বাদ থেকে যিনি বঞ্চিত তিনি বুঝবেন না যে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কী দুর্বার আকর্ষণ।

সাঁতারের প্রাথমিক ব্যবস্থা করতে যা সময় লাগল তারপর এক পুণ্য

প্রভাতে ডোভারের সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিলেন। দীর্ঘদিনের অনভ্যাস এবং প্রায় বিনা অনুশীলনে দম বন্ধ হয়ে আসে, হাত ভারি হয়ে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে—বয়সের ভারও গুরুভার হয়ে দেখা দেয়; কিন্তু ঘণ্টাদুয়েক সাঁতার কাটার পর আবার যেন তিনি শৈশব ফিরে পান। ফ্রান্সের উপকূলে এসে পৌঁছলেন ষোল ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট পরে। প্রথম চেষ্টাতেই আন্তোনিও আবোর্তোন্দো ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হলেন।

কিন্তু এই সাঁতার তাঁর ভাল লাগে নি, সমুদ্র-সন্তরণের পূর্ণ আনন্দ তিনি উপভোগ করতে পারেন নি। পরের পরের বছর ১৯৫১ সনে আবার তাই তিনি ফিরে এলেন ইংল্যাণ্ডে। আবার তিনি ডোভার থেকে ফ্রান্সের তীর পর্যন্ত সাঁতরিয়ে পার হলেন। সময় লাগল চোদ্দ ঘণ্টা কুড়ি মিনিট।

খুশি হলেন তিনি। খুশি হলেন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা। তারা ভাবলেন যে সমুদ্র পার হওয়ার নেশা এবার তাঁর কেটে যাবে। বছর-দুয়েক তিনি চুপ করে রইলেন, কিন্তু আবার ১৯৫৪ সনে কাউকে না জানিয়ে ফ্রান্সের উপকূলে এসে তিনি উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর বয়স ছেচল্লিশ বছর, কিন্তু বয়সের ভার তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারল না। অতি সহজেই তিনি ফ্রান্স থেকে ডোভার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হলেন। সময় লাগল চোদ্দ ঘণ্টা কুড়ি মিনিট। বার বার তিন বার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হওয়ার প্রথম 'হ্যাট ট্রিক।' প্রথম বিশ্ব-রেকর্ড। আন্তোনিও রেকর্ড স্থাপন করে ফিরে গেলেন দেশে।

অন্য কেউ হলে এখানেই খুশি মনে দীর্ঘ সাঁতারের পালা শেষ করে দিয়ে আত্ম-প্রসন্নতায় নিমজ্জিত হতে পারতেন, কিন্তু আন্তোনিও সে ধাতুতে গড়া লোক নন। সমুদ্রের স্বাদ আবার তিনি লাভ করেছেন, প্রতিনিয়তই তিনি সমুদ্রের আহ্বান শুনতে পাচ্ছিলেন।

পঞ্চাশ বছর বয়সে রাশিয়ার উপকূলে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। রাশিয়ার তীর থেকে আর্জেন্টিনার সাচ ইসিদ্রোর তীর পর্যন্ত প্রায় তিনশো মাইলের সমুদ্র-পথ তিনি সাঁতরিয়ে পার হলেন চুরানব্বই ঘণ্টা আঠারো

মিনিটে। সমস্ত জগৎ আশ্চর্য হয়ে গেল প্রৌঢ় আস্তোনিওর এই সন্তরণ-দক্ষতায়।

আস্তোনিও ঘোষণা করলেন যে আর সমুদ্র পারাপার নয়। সমুদ্র-বিজয় থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করাই স্থির করেছেন। কারণ হিসেবে জানালেন যে তাঁর বয়স এখন সুদীর্ঘ সাঁতার কাটা এবং সমুদ্রের ঢেউ ও স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিপন্থী। তাছাড়া এই সন্তরণের সময় সম্ভাব্য দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করেন—তাঁদের মনোবেদনার কারণ তিনি হতে চান না।

এক বছর, দু-বছর করে চার বছর কেটে গেল। চুয়ান্ন বছর বয়সে ১৯৬১ সনে আস্তোনিও আবার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ইতিপূর্বে একই সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল দুবার পার হতে কেউ সক্ষম হননি। অনেককেই মধ্যপথে ক্ষান্ত হতে হয়েছে। ইংলিশ চ্যানেল পারাপার হওয়া কি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়?

১৯৬১ সনের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে তিনি আবার ইংল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। এবারে কঠিন পাল্লা, তার ওপর তাঁর এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। শরীর ঠিক রাখার জন্য তিনি দেশ থেকে রাঁধুনি আনালেন দেশী খাবার আনালেন আর সেইসঙ্গে আনালেন আর্জেন্টিনায় জন্মানো কাঁচা চা।

আস্তোনিওর সমুদ্র-সন্তরণের অতীত সাফল্য সম্বন্ধে সকলেই সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন; কিন্তু এই বয়সে একই সঙ্গে দু-দুবার ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া একেবারে অসম্ভব—সন্তরণ-বিশেষজ্ঞেরা শুধু যে একথা ঘোষণা করলেন তা নয়, এই মারাত্মক সাঁতার বন্ধ রাখতেও তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু আস্তোনিওকে দমিয়ে রাখা অসম্ভব। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী সন্তরণবীর স্যাম রকেটের তত্ত্বাবধানে তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুশীলন করলেন।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১। সকাল সাড়ে আটটায় তিনি ডোভারের উপকূল থেকে সাঁতার কাটতে শুরু করলেন। স্যাম রকেট, একজন ডাক্তার, রাঁধুনি এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ একটা মোটর-বোটে করে সঙ্গে

সঙ্গে চললেন। দূরে কুয়াশা-স্তিমিত ফরাসী উপকূল রোমাঞ্চক রহস্যে আবৃত।

শুরু হল সহনশীলতা পরীক্ষার এক আশ্চর্য অধ্যায়। এর চেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র আন্তোনিও সাঁতরিয়ে পার হয়েছেন, কিন্তু এত বড় কঠিন সন্তরণ পরীক্ষায় আর কোনদিন তিনি অবতীর্ণ হন নি। ইংলিশ চ্যানেলের সবচেয়ে বড় বাধা হয়েছে তার তীব্র স্রোত এবং জোয়ার-ভাঁটা। তীব্র স্রোত সাঁতারুদের নির্দিষ্ট পথ থেকে টেনে অন্য পথে নিয়ে যায় এবং ভাঁটার মুখে পড়লে তীরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাছাড়া রাত্রি নামলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, জল তখন বরফের মত হিম—হাত-পা চালানো যায় না, শরীরের রক্ত জমে আসে, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সাঁতারু এই দুঃসহ শীত সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

প্রথম দিন দিনের বেলা আন্তোনিও স্বচ্ছন্দ গতিতে সাঁতার কেটে চললেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্যাম রকেট তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। আন্তোনিওর এতটুকু শ্রমক্লান্তি দেখা গেল না। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গেই হু-হু করে তাপ কমতে লাগল, ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করল, শীতে মোটর-বোটের প্রত্যেকেই কাঁপতে লাগলেন। সমস্ত সমুদ্র জুড়ে অন্ধকার নেমে এল। মোটর-বোটের সার্চ-লাইটের আলো সেই কালো সমুদ্রের বুকে এক-চিলতে পড়েছে। সেই স্বল্প-আলোকিত জল ভেদ করে আন্তোনিও সাঁতার কেটে চললেন।

অবশেষে ফ্রান্সের কূল থেকে আলো দেখা গেল। সাঁতারের প্রথম পর্যায় প্রায় সমাপ্ত, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায় বা সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ের তখনও অনেক বাকি।

রাত প্রায় সাড়ে তিনটের সময় তিনি ফ্রান্সের তীরে এসে উঠলেন। মাত্র দু-মিনিট সময় লাগল ফ্রান্সের তীরের পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তারপর আবার তিনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যাঁরা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হয়েছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে গভীর রাত্রির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একাকী সাঁতার কাটার কী

যন্ত্রণা। সমুদ্রের জলে তখন হিমপ্রবাহ, সারাদিন সন্তরণের পর শরীর তখন অবসন্ন, চোখে তখন সাতরাজ্যের ঘুম। এই প্রচেষ্টা, এই পরিশ্রম তখন মনে হয় একান্ত নিরর্থক। অন্ধকার রাত্রির মৌন সমস্ত দেহ-মনকে এক হতাশ বিষাদে অবসন্ন করে তোলে, অজানা এক আশঙ্কার মাঝে তাকে নিক্ষেপ করে। চারিদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার—ওপরে জমাট শীতল কুয়াশা, নিচে মৃত্যু-শীতল সমুদ্র। শুধু এ মোটর-লঞ্চের এক ফালি আলো তার সঙ্গী, তার আশা ভরসা, তার দিশারী। আর কতক্ষণ এই অন্ধকার নিয়ে থাকতে হবে, কখন আবার পরিচিত কোন মুখ দেখা যাবে?

যখন সূর্যোদয় হল তখনও আন্তোনিও স্বচ্ছন্দগতিতে সাঁতার কেটে চলেছেন। তখনও অনেক পথ, অনেক সময় জুড়ে মর্মযাতনা অনুভব। স্যাম রকেট উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, কিন্তু আন্তোনিও সাঁতার বন্ধ করলেন না।

কিন্তু বয়স এবং পরিশ্রম—দুয়ের ভারেই তাঁর গতিবেগ অনেক কমে গেছে। তার জন্য সাঁতারের সমস্ত পরিকল্পনা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এমনভাবে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল যাতে সাঁতারের শেষ মুখে হল্যাণ্ড-অভিমুখী স্রোত ধরতে পারেন; কিন্তু এই ধীরগতির জন্য তা আর সম্ভব হবে না, এখন স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে হবে। পরিশ্রান্ত অবস্থায় স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটা যে কী নিদারুণ কঠিন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানে না।

সন্ধ্যা কেটে গেল। আবার সেই অন্ধকার শীতল রাত্রি। স্যাম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আর এক রাত্রি জুড়ে আন্তোনিও কি সাঁতার কেটে যেতে পারবেন?

রকেট আন্তোনিওকে জানালেন যে এইবারেই স্রোতের গতি পরিবর্তিত হয়ে বিপরীত দিকে যাবে এবং এবার তাঁকে সাঁতার কাটতে হবে স্রোতের বিপরীতে। আন্তোনিও সমস্ত কথা শুনে বললেন যে ঘুমে তাঁর চোখ ভেঙে আসছে, স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটার আগে তিনি একটু ঘুমিয়ে নিতে চান।

সমুদ্রের মধ্যেই দুটো হাত জোড়া দিয়ে তার ওপর মাথা রেখে আন্তোনিও চোখ বুজে ভাসতে লাগলেন। ঘণ্টাদুয়েক পরেই ঘুম থেকে উঠলেন। ক্লান্তির অনেকখানি নিরসন হয়েছে।

এবার স্রোতের বিরুদ্ধে তিনি আবার সাঁতার কাটতে লাগলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর রাত্রি চারটে বেজে কুড়ি মিনিটের সময় তিনি আবার ডোভারের উপকূলে এসে উঠলেন—তেতাল্লিশ ঘণ্টা পাঁচ মিনিট অবাধ সন্তরণের পর।

আন্তোনিও আবোর্তোন্দো আবার জয়ী হলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন আর-এক বিশ্ব-রেকর্ড—একই সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার হওয়ায় পৃথিবীতে প্রথম।

ভাগ্যের বিড়ম্বনা

বাছাই-করা খেলোয়াড়, পৃথিবীর আশ্চর্য-সুন্দর পাঁচটি ফরোয়ার্ড—তবু তারা জয়লাভ করতে পারল না।

স্পেনের রাজধানী ম্যাড্রিডের দুটি টীম—রিয়েল ম্যাড্রিড আর বার্সিলোনা। রিয়েল ম্যাড্রিডের ইউরোপ-জোড়া নাম। প্রথম বছর ছাড়া প্রতি বছর তারা ইউরোপীয়ান কাপের ফাইনালে উঠেছে। বার্সিলোনা আগের বছর ম্যাড্রিডের লীগ চ্যাম্পিয়ান হিসাবে খেলতে এসেছে ইউরোপীয়ান কাপে। বার্সিলোনার এই অভ্যুদয়ের মূলে তাঁদের ম্যানেজার—হেলেনিও হেরেরা। তিনি বেছে বেছে পাঁচটি ফরোয়ার্ড আনলেন।

হাঙ্গারির কুবালা রাউট আউট। হাঙ্গারি চেকোস্লোভাকিয়া আর স্পেন—এই তিন দেশের জাতীয় দলের খেলোয়াড়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অপূর্ব ড্রিবলিং করার ক্ষমতা। রাইট-ইনে এভারিস্তো। ব্রেজিলের খেলোয়াড়। ক্ষিপ্র এবং গোল করতে ওস্তাদ। সেণ্টার ফরোয়ার্ডে হাঙ্গারির ককসিস্। লেফট-ইনে স্পেনের সুয়ারেজ—পুস্কাসের পরে এত ভাল খেলোয়াড় আর দেখা যায় নি। লেফট আউটে হাঙ্গারির জিবর।

এই ফুটবল দল নিয়ে হেরেরা বার্সিলোনাকে স্পেনের চ্যাম্পিয়ান টীম করে তুলেছিলেন। লীগের খেলায় বার্সিলোনা রিয়েল ম্যাড্রিডকে ৩—১ গোলে পরাজিত করেছিল; কিন্তু এই বছরের ইউরোপীয়ান কাপের সেমি-ফাইনালে তারা পরাজিত হয় রিয়েল ম্যাড্রিডের কাছে। হেরেরার চাকরি গেল।

নূতন ম্যানেজার হলেন বেনসিক। তিনি হেরেরার টীমকে নিয়ে গত বছরের মুলতুবি ফাইনাল খেলতে গেলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী দল পোর্তুগালের বেনেফিকা।

সুইজারল্যাণ্ডের বার্ন-এ খেলা হবে।

দর্শকদের সকলেরই জানা যে বার্সিলোনা অত্যন্ত সহজে এই খেলায় বিজয়ী হবে। তারা শুধু বার্সিলোনার দুর্ধর্ষ পাঁচটি ফরোয়ার্ডের খেলা দেখতে এসেছে।

খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বার্সিলোনার পায়ে বল। বল দিয়ে সারা মাঠে ফরোয়ার্ডেরা নক্সা কেটে যেতে লাগল। সুয়ারেজ পায়ে বল নিয়ে বিপক্ষ দলের দু-তিনটি খেলোয়াড়কে সম্মোহিত করে একেবারে ফাঁকা জায়গায় সুন্দর পাস দিচ্ছেন। খেলার গতি আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। এবারে দুই আউট মাঝে-মাঝে তীব্র গতিতে বল নিয়ে ছুটছেন। তাঁদের খেলা দেখে মনে হচ্ছে যেন যখন খুশি তখনই তাঁরা ইচ্ছা করলে গোল করতে পারেন।

কিন্তু বেনেফিকার সেণ্টার-হাফ জার্মানো কিংবা গোল-কীপার পেরেরাও সমান তালে সুন্দর খেলে দর্শকদের অনুরূপ মুগ্ধ করছেন।

ভাল খেললেই হবে না, একটা গোল হওয়া দরকার। সুয়ারেজ আর কুবালা এবার একটু যেন নড়ে বসলেন। বল নিয়ে সুয়ারেজ রাইট আউটের জায়গায় চলে গেলেন, সেখান থেকে বেনেফিকার লেফট হাফ ক্রুজকে কাটিয়ে কুবালাকে পাস দিয়েই যেন ফেরৎ-পাস নেবার জন্য ক্রুজের পাশ দিয়ে ছুটে যেতে লাগলেন। কিন্তু সে পাস যে আসবে না তা তিনি জানতেন। বেনেফিকার লেফট ব্যাক এঞ্জেলা সুয়ারেজকে দৌড়োতে দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য ছুটলেন, কিন্তু কুবালা পাস না দিয়ে নিজে বল নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। এঞ্জেলো কুবালা-সুয়ারেজের এই চালাকি বুঝতে পেরে কুবালার দিকে দৃষ্টি দিতে গেলেন। সুয়ারেজ তবু রেসের ঘোড়ার মত ডান দিকের লাইন ঘেঁসে দৌড়োচ্ছেন। এঞ্জেলা থমকিয়ে দাঁড়ানো-মাত্র কুবালা সুয়ারেজকে এঞ্জেলোর ঠিক পিছনে পাস দিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুয়ারেজ সেই বলটিকে সেণ্টার করলেন এবং ককসিস্ হেড করে গোল দিলেন।

সহজেই বার্সিলোনা এক গোল দিল। সহজেই তারা জয়লাভ করত, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে স্পেনের এবং বার্সিলোনার গোলকীপার

রামালেটসের দুটি মারাত্মক ভুলের জন্য সমস্ত খেলাটাই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল।

এই নাটক শুরু হল প্রথমার্ধের ত্রিশ মিনিটের সময় থেকে। বেনেফিকা দলের এক নম্বর খেলোয়াড় হয়েছে মোজাম্বিকের নিগ্রো কোলুনা—লেফট ইন। তিনি আর রাইট ইন সাণ্টানা আপ্রাণ পরিশ্রম করে খেলার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করছিলেন। কোলুনা হঠাৎ একটা বল লেফট আউট কাভেমকে ঠেলে দিলেন। কাভেম লাইন ধরে দৌড়িয়ে গিয়ে সেণ্টার করলেন। বিশ গজ দূর দিয়ে বল যাচ্ছে, সে বল বার্সিলোনার গোলকীপার রামালেটসের পক্ষে ধরা সম্ভব নয়, তবু তিনি গোল ছেড়ে বল ধরতে ছুটে এলেন। ফাঁকা গোলে সেণ্টার ফরোয়ার্ড আগুয়ার্সের গোল করতে একটুকু অসুবিধা হল না।

সেণ্টারের সঙ্গে সঙ্গেই বার্সিলোনার কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে বেনেফিকার ফরোয়ার্ডেরা গোলমুখে হানা দিল। কোলুনার শট বার্সি-লোনার রাইট ব্যাক ফোঞ্চো সহজেই আটকাতে পারতেন, কিন্তু সেই বলটি মারতে গিয়ে তিনি সোজা আকাশে তুলে দিলেন। বলটি স্পিন করতে করতে পেনালটি সীমানার নিচে নামতে লাগল। আবার রামালেটস গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঘুসি মেরে বলটিকে দূরে পাঠিয়ে দেবার জন্য লাফালেন। ভীত ফোঞ্চোও পিছন ফিরে হেড করার চেষ্টা করলেন। ফোঞ্চো এবং রামালেটসের মধ্যে লাগল প্রচণ্ড ধাক্কা। দুজনেই পড়ে গেলেন। রামালেটসের হাতের পিছন দিকে লেগে নিজেদের গোলের দিকেই বলটি ছুটে গেল। পোস্টে লেগে বলটা গোল লাইন ধরে ঘুরে আবার মাঠে ফেরত এল। রেফারি গোলের নির্দেশ দিলেন। বেনেফিকা ২-১ গোলে অগ্রসর হল।

রামালেটস লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে পোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। বার্সিলোনার খেলোয়াড়েরা হতাশ হয়ে পড়ল।

হাফ টাইমের পর নতুন উদ্যমে বেনেফিকা খেলতে লাগল। সারা মাঠে শুধু তারাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেণ্টার হাফ জার্মানো তখন একাই

একশো। দ্বিতীয়ার্ধের দশ মিনিটের মধ্যে পঁচিশ গজ দূর থেকে তীব্র শটে কোলুনা আর একটি গোল দিলেন। বেনেফিকা এগিয়ে গেল ৩-১ গোলে।

বার্সিলোনা যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মত, তখন দলের প্রবীণ খেলোয়াড় কুবালা দলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। রাইট আউট থেকে তিনি সেন্টার ফরোয়ার্ডে এলেন। কুবালা একাই খেলার মোড় ফিরিয়ে দিলেন। কুবালার নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বার্সিলোনার ফরোয়ার্ডদের আর ধরে রাখা গেল না। পর-পর তিনটে শট পেরেরা প্রতিহত করলেন,···ককসিসের শট বার-এর ওপর দিয়ে চলে গেল, ফাঁকা গোলে হেড করে গোল দিতে পারলেন না।

কিন্তু হতাশ হল না বার্সিলোনা। কুবালা আবার বল নিয়ে ছুটলেন। চলতি বলে এক তীব্র শট করলেন। সেই শটটি গোলকীপারকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে বাঁ পোস্টে গিয়ে লাগল, সেখান থেকে ফিরে ঘুরে গিয়ে লাগল ডান পোস্টে—অথচ গোল একেবারে ফাঁকা। এবারে স্যুয়ারেজ একটা বল নিয়ে গিয়ে দিলেন জিবরকে। জিবর তীব্রগতিতে ছুটে শট মারলেন। সেই শট পেরেরাকে পরাজিত করে নেটে প্রবেশ করল। বেনেফিকা তখন জিতেছে ৩-২ গোলে।

আর এক গোল! বার্সিলোনার ফরোয়ার্ডেরা বেনেফিকার পোস্ট ঘিরে ধরল। বেনেফিকার প্রতিটি খেলোয়াড় গোল লাইনে এসে দাঁড়ালেন। তারই মধ্যে এডারিস্টো একবার ক্রস-বারে বল মারলেন, গোল শোধ দেওয়া আর হল না।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড লাইন নিয়েও পরাজিত হল বার্সিলোনা।

একা এবং তিনজন

মধ্য-দূরত্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরদের মধ্যে একটি ব্রিটিশ নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি হয়েছেন গর্ডন পিরি।

গর্ডন পিরির শ্রেষ্ঠত্বের একটি বিশেষ কারণ এই যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৌড়ের মাঠে তাঁকে একক সংগ্রাম করতে হত। তাঁর যুগে মধ্য-দূরত্বের অনেক প্রতিভাধর দৌড়বীর ছিলেন, বিশেষ করে হাঙ্গারিতে। হাঙ্গারির ত্রিমূর্তি সন্দোর ইহারোস, লাজলো টাবোরি এবং ইস্টভান রোজ-সাভোলগি ছিলেন সে যুগের মধ্য-দূরত্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর। কে যে কখন কোন্ দৌড়ে প্রথম হবেন, কেউ বলতে পারতেন না। এঁদের সঙ্গে সংগ্রামে নামতে হত গর্ডন পিরিকে। এঁরা তিনজনই একই দেশের লোক, সুতরাং তাঁদের এই এক উদ্দেশ্য ছিল যে দৌড়ের শ্রেষ্ঠ সম্মান যেন তাঁদের দেশেই আসে। সেইজন্য তাঁরা তিনজন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এক-একজন এক-এক সময় জোরে দৌড়িয়ে পিরির দম নষ্ট করিয়ে দিতেন। তারপর পিরির গতি যখন মন্থর হয়ে আসত তখন একজন হাঙ্গারিয়ান দ্রুতগতিতে এগিয়ে প্রথম হতেন। পিরিকে সাহায্য করার মত কোন ব্রিটিশ দৌড়বীর ছিলেন না।

গর্ডন পিরি এঁদের কাছে পরাজিতও হয়েছেন, আবার এঁদের পরাজিতও করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ জয়লাভ বোধহয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সনে—সুইডেনের মালামোতে।

কিছুদিন পরেই মেলবোর্নের ওলিম্পিক। মালামোর সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের ক্ষমতার মূল্যায়ন হয়ে যাবে, সুতরাং গর্ডন পিরি ৩০০০ মিটার দৌড়ে নাম লেখালেন। প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে নাম দিলেন হাঙ্গারির ইহারোস, টাবোরি এবং রোজসাভোলগি।

১৯৫৫ সন ছিল ইহারোসের গৌরবের বছর। ওই বছরে ইহারোস

৩০০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, দুই মাইল এবং তিন মাইল দৌড়ে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ১৯৫৬ সনে পিরি ইহারোসের ৫০০০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড ভেঙে দিলেন এবং তার মাত্র তিন দিন পরে তিন হাজার মিটার দৌড়ে তিনি ইহারোসের রেকর্ডের সঙ্গে সমান রেকর্ড করলেন। ইহারোসের তিন হাজার মিটার দৌড়ের সময় ছিল ৭ মিনিট ৫৫·৬ সেকেণ্ড।

এই তিন হাঙ্গরিয়ান এবং গর্ডন পিরি ছিলেন চির-প্রতিদ্বন্দ্বী। এঁরা তিনজনে ওলিম্পিক খেলার ঠিক আগে এই দৌড়ের সুযোগ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এই দৌড়ে যদি পিরিকে পরাজিত করা যায় তবে তাঁর মনোবল ভেঙে যাবে। তখন ওলিম্পিকে তিনি আর নিজের ওপর আস্থা রেখে দৌড়োতে পারবেন না; ওলিম্পিকের তিনটি মেডেলই পেতে পারবে হাঙ্গারি।

জনসাধারণ যখন এই দৌড়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন, তখন এই দৌড় সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা গেল ৪ঠা সেপ্টেম্বর স্টেডিয়ামে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। উত্তেজনায় যেন সমস্ত স্টেডিয়াম থর-থর করে কাঁপছে। অধিকাংশ দর্শকের মনে পিরির ওপর সহানুভূতি, কারণ তিন মহারথীর বিরুদ্ধে তিনি একক সংগ্রামে অবতীর্ণ।

মোট ষোল জন প্রতিযোগী, কিন্তু সকলেই জানেন যে প্রতিযোগিতা হবে মাত্র চারজনের মধ্যে: তিনজন হাঙ্গারিয়ান—ইহারোস, টাবোরি, রোজসাভোলগি এবং একজন ব্রিটিশ—গর্ডন পিরি।

প্রতিযোগীরা দৌড়বার জন্য প্রস্তুত হলেন। বন্দুকের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগীরা একত্রে মাঠে লাফিয়ে পড়লেন।

এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য হাঙ্গারিয়ানদের চাল প্রথম থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। একজন হাঙ্গারিয়ান এগিয়ে থাকবেন এবং অপর দুজন ঠিক তাঁর পিছনে থাকবেন পিরিকে বাধা দেবার জন্য। প্রথম জন ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি পিছিয়ে আসবেন এবং তাঁর পরিবর্তে আর এক হাঙ্গারিয়ান এগিয়ে যাবেন।

প্রথমেই ইহারোস এগিয়ে গেলেন। ঠিক তাঁর পিছন পিছন রইলেন টাবোরি ও রোজসাভোলগি, সমান তালে ছুটে চললেন তাঁরা। পিরি রইলেন ঠিক এঁদের পিছনে। বাদ-বাকি প্রতিযোগীরা পড়ে রইলেন অনেক পিছনে।

কিছুক্ষণ পরে ইহারোস পিছিয়ে গেলেন, সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এগিয়ে গেলেন টাবোরি। পিরি সহজ ভঙ্গীতেই এই তিনজনের পিছন-পিছন দৌড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এই তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর। যে-কোন সময়ে এঁদের মধ্যে একজন তীব্র গতিতে এগিয়ে যেতে পারেন, তখনই পিরির সবচেয়ে ভয়ের সময়। অপর দুজন তাঁকে অগ্রসর হতে না-ও দিতে পারেন।

হাঙ্গারিয়ানদের উদ্দেশ্য ছিল এই দৌড়ে আবার নতুন রেকর্ড স্থাপন করা, সেইজন্য তাঁরা প্রথম থেকেই খুব দ্রুত গতিতে দৌড়োচ্ছিলেন। আরও তাঁরা জানতেন যে শেষ মুহূর্তে পিরি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি হয়ে ওঠেন। সুতরাং প্রথম থেকেই দৌড়ের গতি তীব্রভাবে বৃদ্ধি করতে পারলে শেষ পর্যন্ত পিরি এত ক্লান্ত হয়ে পড়বেন যে শেষ মুহূর্তের ক্ষিপ্রতা আর তাঁর থাকবে না।

আধা-আধি দৌড়ের পর টাবোরি পিছিয়ে পড়লেন এবং ইহারোস দৌড়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

স্টেডিয়ামে তুমুল উত্তেজনা দেখা গেল। এইবার বোধহয় ইহারোস হঠাৎ তীব্র গতিতে অগ্রসর হবেন। সকলে সেই সময়টুকুর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। ভয় পেয়ে গেলেন পিরি। তিনি তাঁর গতি বৃদ্ধি করে টাবোরি আর রোজসাভোলগিকে অতিক্রম করে ঠিক ইহারোসের পিছনে দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করলেন; কিন্তু হাঙ্গারিয়ানরা পিরিকে কিছুতেই অগ্রসর হতে দেবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রোজসাভোলগি ছুটে ইহারোস ও পিরির মাঝামাঝি স্থান নিলেন।

এইবার দৌড়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বুদ্ধির লড়াই দেখা গেল। দর্শকরা উত্তেজনায় চিৎকার করতে লাগল। এইবার রোজসাভোলগি দৌড়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন, একটু পিছিয়ে পড়লেন ইহারোস।

আর মাত্র দুই ল্যাপ যখন বাকি তখনও রোজসাভোলগি প্রথম, দ্বিতীয় ইগারোস, তৃতীয় পিরি এবং চতুর্থ টাবোরি। দৌড়ের গতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্টেডিয়ামে দর্শকেরা উদগ্র আগ্রহ নিয়ে দৌড়ের গতি লক্ষ্য করছে। এখন যা অবস্থা, তাতে যে-কেউ জয়লাভ করতে পারেন।

শেষ ল্যাপের যখন ঘণ্টা বাজল তখনও পর্যন্ত এই চারজন ঠিক একই অবস্থায় প্রায় জড়াজড়ি করে ছুটছেন। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছেন—জয়লাভের জন্য কে আগে দল ছেড়ে তীব্রবেগে ধাবিত হন তাই দেখতে। চারজনেরই মুখে উদ্বেগের ছাপ, প্রত্যেকেরই শরীরে ধীরে ধীরে শ্রান্তি নেমে আসছে।

হঠাৎ স্টেডিয়াম থেকে তীব্র চিৎকার শোনা গেল। রোজসাভোলগি হঠাৎ দল ছেড়ে তীব্র গতিতে দৌড়তে শুরু করেছেন। এক মুহূর্তের জন্য হতচকিত হয়ে গেলেন অপর তিনজনে, তারপর তাঁরা বাঘের মত পলায়নরত হরিণের পিছনে যেন ছুটতে লাগলেন।

সত্তর মিটার যখন বাকি তখন পিরি দল ছেড়ে বাইরের দিকের লাইন ধরলেন। শেষ পর্যায়ের দৌড়ে তিনি ইহারোস ও টাবোরির মাঝে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চান না। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি রোজ-সাভোলগিকে ধরে ফেললেন।

এইবার দর্শকদের উত্তেজনার আর সীমা রইল না। সকলের চিৎকার শোনা যেতে লাগল—পিরি—পিরি বাক আপ পিরি—

এক পা, দু-পা—রোজসাভোলগিকে ধীরে ধীরে অতিক্রম করে পিরি অগ্রসর হতে লাগলেন। ইহারোস এবং টাবোরিও একবার শেষ চেষ্টা করলেন; কিন্তু রোজসাভোলগিকে প্রায় দশ হাত পিছনে রেখে প্রথম হলেন পিরি। দ্বিতীয় হলেন রোজসাভোলগি, তৃতীয় ইহারোস এবং চতুর্থ টাবোরি।

প্রতিযোগিতায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু প্রতিযোগিতার শেষে প্রকৃত গুণগ্রাহী এই চারজনেই। তিনজন হাঙ্গারিয়ান গর্ডন পিরিকে এই জয়লাভের জন্য অভিনন্দিত করলেন। পিরিকে সামনে রেখে তাঁরা

তিনজন স্টেডিয়ামের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করলেন। দর্শকেরাও পিরিকে এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করলেন।

ঠিক এই সময়ে লাউডস্পীকারে ঘোষিত হল—গর্ডন পিরি এই দৌড়ে তাঁর নিজের পূর্ববর্তী রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। সময় লেগেছে মাত্র ৭ মিনিট ৫২·৮ সেকেণ্ড।

পরাজয় থেকে জয়

ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে গত দশ পনের বছরের মধ্যে কোন্ টেস্ট ম্যাচটি এক রোমাঞ্চক উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছে? কোন্ টেস্ট ম্যাচটির শেষ ফলাফলের জন্য শুধু দর্শক-দল নন, খেলোয়াড়েরা পর্যন্ত এক অস্বস্তিকর উদ্বেগের মধ্যে প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি বল গুনে চলেছিলেন? খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলার শেষ ফল সম্বন্ধে এতটুকু ভবিষ্যদ্বাণী করতে কেউ সাহসী হন নি?

একবাক্যে সকলেই বলে উঠবেন—ওরেলের অধিনায়কতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৬০-৬১ সনের অস্ট্রেলিয়া সফরের সেই চিত্ত-চাঞ্চল্যকর টেস্ট ম্যাচ—যার ফলাফল শুধু ড্র নয়, রান-সংখ্যা দু-দলেরই সমান সমান,—সেই বিশ্ব-বিশ্রুত 'টাই-ড্র' টেস্ট ম্যাচ!*

রিচি বেনো ছিলেন সেই বহু-আলোচিত টেস্ট ম্যাচের অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক। দর্শক, সমালোচক এবং খেলোয়াড়দের সকলের সঙ্গে একত্র হয়ে সমানভাবে তিনিও তখন অনুভব করেছিলেন সেই খেলার উত্তেজনার শেষ মুহূর্তগুলি। তাই এই ম্যাচ সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের নিশ্চয়ই একটা মূল্য আছে। কিন্তু তাঁর নিজের মতে এই টেস্ট ম্যাচটি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কিংবা সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাকর টেস্ট ম্যাচ নয়।

রিচি বেনোর কথায় বিস্মিত হতে হয়, তবু তাঁর কথা বিশ্বাস না করেও পারা যায় না। সকলের তো আর সমস্ত খেলা দেখার সৌভাগ্য হয় না। বেনোর জীবনে হয়ত এমন ক্রিকেট খেলা এসেছে যা অনেকে দেখেন নি, কিংবা দেখলেও বিশেষ কোন রেকর্ড স্থাপন বা অঘটন না ঘটার জন্য হয়ত কেউ তা সহজে স্মরণ করতে পারেন না।

---

* এই বইয়ের 'একমেব অদ্বিতীয়ম্' রচনাটি দ্রষ্টব্য।

বেনোকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—কোন্ সে টেস্ট ম্যাচ যাকে আপনি আপনার জীবনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন ?

তিনি উল্লেখ করেন ১৯৬১ সনে তাঁর অধিনায়কতায় ইংল্যাণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট ম্যাচের কথা।

এই টেস্ট ম্যাচ সম্বন্ধে বেনো লিখেছেন :

> "আমি যতগুলো টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছি, এই টেস্ট ম্যাচের মত আর কোন খেলাই এত রোমাঞ্চক উত্তেজনা সৃষ্টি করে নি—এমনকি ১৯৬০-৬১ সনের অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেই প্রসিদ্ধ 'টাই' এবং 'ড্রন' ম্যাচটিও নয়।"

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড স্ট্যাফোর্ড মাঠের টেস্ট ম্যাচ।

এই সিরিজের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ এটি। এই খেলাটির ওপরেই 'অ্যাশেস' জয়লাভ নির্ভর করছে দু-দলেরই, কারণ ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত দুটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া প্রত্যেকেই একটি করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে। ইংল্যাণ্ডের প্রকৃতি দেবী অত্যন্ত খামখেয়ালী। কখন বৃষ্টি নেমে এসে টেস্ট খেলা নষ্ট করে দেয়, কেউ বলতে পারে না। সুতরাং আবহাওয়া ভাল থাকতেই খেলায় এগিয়ে থাকা একান্ত দরকার।

দুই দলই সম্ভবমত বাছাই টীম ঘোষণা করল :

অস্ট্রেলিয়া : লরি, সিম্পসন, বুথ, ও'নীল, হার্ভে, বার্জ, ম্যাককে, বেনো (অধিনায়ক), গ্রাউট, ডেভিডসন এবং ম্যাকেঞ্জি।

ইংল্যাণ্ড : সুব্বারাও, পুলার, মে (অধিনায়ক), ডেক্সটার, ক্লোজ, ব্যারিংটন, মারে, ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম, অ্যালেন, এবং ফ্ল্যাভেল।

খেলার দিন সকালে পিচ পরিদর্শন করতে নামলেন অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিচি বেনো এবং সহ-অধিনায়ক নীল হার্ভে। পিচের অবস্থা দেখে খুব খুশি হলেন। জানালেন—সুন্দর পিচ, ব্যাট্স্ম্যানদের স্বর্গ।

আকাশে বেশ মেঘ আছে, খেলার মধ্যেই বৃষ্টি নেমে আসতে পারে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে যত বেশি রান করা যায় ততই ভাল। সুতরাং টসে জিতে বেনো ব্যাট করাই স্থির করলেন।

প্রথম দিনে সূচনা বিশেষ ভাল হল না। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম তিনটে উইকেট পড়ে গেল মাত্র ১২৪ রানে। একমাত্র বিল লরিই একটু মাথা ঠাণ্ডা করে খেললেন এবং খেলার শেষে নট-আউট রইলেন। খেলার মাঝেই প্রবল বৃষ্টি নেমে সেদিনকার মত খেলা ধুয়ে-মুছে দিয়ে গেল।

বৃষ্টির পরে পিচের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। অস্ট্রেলিয়া শেষ সাতটি উইকেটে যোগ করতে পারল মাত্র ৬৬ রান। সমস্ত উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ১৯০ রান—তার মধ্যে লরি করেছেন ৭৪ এবং ব্রায়ান বুথ ৪০ রান। ট্রুম্যান ও স্ট্যাথামের মারাত্মক জোর বলে ও'নীল আহত হয়েছিলেন সত্য, তবুও সিম্পসন, হার্ভে, ও'নীল, বার্জ, ম্যাককে এবং বেনোর মত বিচক্ষণ ব্যাটস্‌ম্যানেরা কী করে যে ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম, ডেক্সটার এবং ফ্ল্যাভেলের ফাস্ট ও মিডিয়াম ফাস্ট বলে অতি সহজেই আউট হয়ে গেলেন—এটাই আশ্চর্য।

ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের খেলার জন্য ব্যাট করতে নামল। রোদ উঠে তখন পিচের অবস্থা বেশ ভাল। পিটার মে আর ব্রায়ান ক্লোজ সুন্দর মারের খেলা দেখিয়ে তা প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন। ডেভিডসনের বলের মুখে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না ডেক্সটার। শেষের দিকের চারটে উইকেট দখল করলেন সিম্পসন, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর বল করেছিলেন ডেভিড্‌সন। ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসে মোট রান করল ৩৫৭, অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১৬৭ রানে এগিয়ে।

দুরু-দুরু বুকে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় শেষ পর্যন্ত নট-আউট থাকলেন লরি এবং সিম্পসন।

রবিবার বিশ্রাম।

সোমবার আবার খেলা শুরু করলেন লরি ও সিম্পসন। ১৫৩ রানের মাথায় সিম্পসন আউট হয়ে গেলেন। প্রথম ইনিংসের আঘাতের পর দ্বিতীয় ইনিংসে লরি করলেন সেঞ্চুরি। ও'নীলও প্রথম ইনিংসের আঘাতের পর দ্বিতীয় ইনিংসে চতুর্দিকে পিটিয়ে ৬৭ রান করলেন। কিন্তু অল্প রানের মধ্যে আউট হয়ে গেলেন বার্জ আর বুথ। ডেভিডসন

আর ম্যাককে সেদিনকার মত সময় কাটানোর জন্য মাটি কামড়িয়ে পড়ে রইলেন।

শুরু হল শেষ দিনের খেলা।

পিটার মে নাটকীয়ভাবে ডেক্সটারের বদলে অফ-স্পিনার ডেভিড অ্যালেনকে রেল লাইনের দিক থেকে বল করতে আনলেন। স্ট্যাথাম আর ট্রুম্যানের জুতোর দাগে পিচ ক্ষত-বিক্ষত। এই ক্ষতের সাহায্য নিলেন অ্যালেন। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার তিনটি উইকেট পড়ে গেল। একটি ক্ষতে বল পড়ে ভীষণভাবে স্পিন করে ম্যাককেকে বোল্ড আউট করল। বেনো হলেন এল. বি. ডব্লু.। গ্রাউট বল বুঝতে না পেরে মিড-অফে ক্যাচ তুললেন। ডেভিড অ্যালেনের জয়জয়কার।

অস্ট্রেলিয়ার নয় উইকেট হারিয়ে ৩৩৪ রান, ইংল্যাণ্ডের চেয়ে মাত্র ১৬৭ রানে এগিয়ে। বাকি মাত্র বোলার ম্যাকেঞ্জি। এই বছর প্রথম বিদেশে ক্রিকেট খেলতে এসেছেন, একেবারে নতুন এবং অনভিজ্ঞ। সুতরাং আর মাত্র কয়েকটি বল, তার পরেই খেলা শেষ। এখনও সারা দিন পড়ে রয়েছে, দেড়শো রান তুলতে ইংল্যাণ্ডের আর কতক্ষণ লাগবে?

স্টেডিয়ামে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন হার্ভে। বেনোকে বললেন—আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কী? ফিল্ডিং-এর জন্য তৈরি হওয়া যাক।

হতাশায় বেনোর মন ভরে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার যে-রকম সুদক্ষ ব্যাটসম্যান ছিল তাতে তাঁদের পক্ষে শেষ দিনে আরো আড়াইশো রান করা একেবারে অসম্ভব ছিল না। এই রান করতে পারলে জয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দেওয়া যেতে পারত। এখন সারাদিন চেষ্টা করতে হবে পরাজয় এড়ানোর।

ডেভিডসন কিন্তু তখনও হাল ছাড়েন নি। ব্যাট দিয়ে পিচ ঠুকতে ঠুকতে ম্যাকেঞ্জিকে বললেন—ঘাবড়াবার কিছু নেই। বলের লাইন দেখে ব্যাট সোজা করে ঠেকিয়ে যাও।

ম্যাকেঞ্জি চেষ্টা করলেন টিকে থাকতে। অ্যালেনের বল আটকাতে গিয়ে বার বার ভুল করলেন এবং আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পেলেন। এইভাবে

খেলে তো আর জয়লাভ করা যায় না। যে-কোন সময়ে ম্যাকেঞ্জি আউট হয়ে যেতে পারেন।

সময়ই এখন অস্ট্রেলিয়াকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। বেনো মনে মনে ভাবলেন—রান না হোক সময় নষ্ট হোক। ড্র করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

স্ট্যাথাম অত্যন্ত নিখুঁত এবং নির্ভুল লেংথে বল দিয়ে যাচ্ছেন, ডেক্সটারও 'কাটার' এবং 'লেট সুইং' বল দিয়ে যাচ্ছেন। ডেভিডসন অবিচল স্থৈর্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যাটস্‌ম্যানের মত খেলে যাচ্ছেন।

পিটার মে চেষ্টা করেছিলেন যাতে ম্যাকেঞ্জি একটু বেশি সময়ের জন্য অ্যালেনের স্পিন বলের মুখোমুখি হন; কিন্তু ডেভিডসন ম্যাকেঞ্জিকে স্পিন বলের মুখে থাকতে দেন নি। সুতরাং মে ডেক্সটারের বদলে আনলেন ক্লোজকে—দুই দিক থেকেই স্পিন বলের আক্রমণ শুরু হোক। অ্যালেনের ভার নিলেন ডেভিডসন, ক্লোজের বল মারতে লাগলেন ম্যাকেঞ্জি। কিন্তু এইভাবে তো আর সারাক্ষণ চলবে না, একবার না একবার অ্যালেনের বলের মুখোমুখি ম্যাকেঞ্জিকে হতেই হবে।

এই সমস্যার সমাধানের ভার ডেভিডসন নিজের হাতে তুলে নিলেন। যেমনভাবেই হোক, অ্যালেনকে সরাতেই হবে। হঠাৎ ডেভিডসন লাফিয়ে অ্যালেনের ওভারের প্রথম বলকে পাঠালেন কভার বাউণ্ডারিতে, দ্বিতীয় বলে করলেন দুই রান, তৃতীয় বলে আবার বাউণ্ডারি, পঞ্চম বলে আর একটা বাউণ্ডারি এবং ষষ্ঠ বলটিকে তুলে স্ক্রীনের উপর দিয়ে ওভার বাউণ্ডারি করলেন। অ্যালেনের এক ওভারে কুড়ি রান।

অ্যালেন ঘাবড়িয়ে গেলেন। এরকম বেধড়ক মার তিমি আর জীবনে খাননি। হতভম্ব হয়ে মে স্পিনারদের সরিয়ে নিলেন। আনলেন স্ট্যাথাম আর ট্রুম্যানকে। কিন্তু তাঁরাও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারলেন না। ম্যাকেঞ্জি এখন নিজের ওপর আস্থা রেখে বল খেলতে পারছেন, সুতরাং ডেভিডসন আর তাঁকে আড়াল দিয়ে খেলবার চেষ্টা করলেন না।

প্যাভেলিয়ানে হার্ভে তাঁর চেয়ারটা বেনোর পাশে এনে বসে বললেন, —আড়াইশো রানে এগিয়ে থাকলে জেতা যেতে পারে, কী বল?

বেনো উত্তর দিলেন— কথা না বলে খেলা শেখ।

শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যাভেলের বলে আউট হলেন ম্যাকেঞ্জি। ডেভিডসন ৭৭ রান করে নট আউট রইলেন। শেষ জুটিতে ডেভিডসন ও ম্যাকেঞ্জি করলেন ৯৮ রান—টেস্ট রেকর্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার রান ৪২০। ২৫৪ রান করতে পারলে ইংল্যাণ্ড জয়ী হবে এবং তার জন্য তাদের ঘণ্টায় ৬৭ রান করতে হবে।

ইংল্যাণ্ড শুরু করল দ্বিতীয় ইনিংস।

বেনোর হাতে আছে এখন দুটিমাত্র পথ—হয় আড়াইশো রানের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের দশটি উইকেট দখল করা, অথবা যথাসম্ভব কম রান করতে দিয়ে ম্যাচটিকে ড্র করানো।

সুব্বারাও এবং পুলার নিশ্চিন্ত মনে ব্যাট করে চললেন। লাঞ্চের সময় পর্যন্ত দুজনেই নট আউট। লাঞ্চের পরে ৪০ রানের মাথায় পুলার হুক করার লোভ সামলাতে পারলেন না, আউট হয়ে গেলেন।

এবার এলেন ডেক্সটার। প্রথম ইনিংসে কিছু করতে পারেন নি বলেই যেন প্রথম থেকেই অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের পেটাতে শুরু করলেন। বেগতিক দেখে বেনো নিজে বল দিতে নামলেন, কিন্তু সেদিন আর ডেক্সটারকে রোখে কে? লর্ডের মত প্রতিটি বোলারকে উপেক্ষা করে উই-কেটের চারিদিকে চমকপ্রদ স্ট্রোক করে যেতে লাগলেন। ব্যাক-ফুট বা ফ্রন্ট-ফুটের ওপর থেকে ড্রাইভ, ম্যাককের বলে উঁচু শট, কিংবা যখনই কোন বোলারের শর্ট লেংথ বল পেয়েছেন তাকে সজোরে ‘কাট’ করা—ক্রিকেট খেলার সবকটি শটই অনায়াস ভঙ্গিতে করে গেলেন। ৭০ মিনিট উইকেটে ছিলেন ডেক্সটার, সারা মাঠে তারাবাজি ছুটিয়ে নব্বইয়ের কোঠায় তিনি আউট হলেন। বেনোর বলে গ্রাউটের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে ক্রীজ ছেড়ে চলে গেলেন। অনায়াসে সেঞ্চুরি করতে পারতেন, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ওপর চরম উপেক্ষা নিয়েই যেন তিনি সেঞ্চুরি করলেন না।

ডেক্সটার এসে খেলার মোড় সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে গেলেন। ম্যাচ এখন আর ড্র হওয়া সম্ভব নয়, এখন হয় জয়, নয় পরাজয়।

নীল হার্ভে বেনোকে বললেন—জয়ের চেষ্টা করা যাক, নয় তো পড়ে মার খেতে হবে।

ঠিক সেই সময়ে বেনোর মনে পড়ে গেল লিণ্ডওয়ালের কথা। লিণ্ডওয়াল হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার শ্রুতকীর্তি ফাস্ট বোলার, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার। লাঞ্চের বিরতির সময় বেনোকে নিয়ে পিচ দেখতে এসে পিচের ওপরে ট্রুম্যান আর স্ট্যাথামের বুটের দাগ দেখিয়ে বলেছিলেন—রিচি, এই ক্ষতগুলো কাজে লাগাবার চেষ্টা কর। কিন্তু খুব সাবধান; লেংথ যেন ঠিক থাকে, নয়তো পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে।

মে খেলতে নামলেন। বেনো লিণ্ডওয়ালের কথামত লক্ষ্য করে করে বল দিলেন। প্রথম বলটিকে মে কোনগতিকে ব্লক করলেন। দ্বিতীয় বলটি লাফিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মে সুইপ করার চেষ্টা করলেন। বলটি স্পিন খেয়ে মে-র পায়ের পিছন দিয়ে ঘুরে লেগ স্টাম্পের ওপর এসে পড়ল। ক্লোজ নেমেই পিটিয়ে রান তোলার চেষ্টা করলেন— ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করতে চায়। কিন্তু ক্লোজ বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না। বেনোর বলে ও'নীলের হাতে আউট হলেন। চা-বিরতির আগে সুব্বারাও-ও আউট হয়ে গেলেন। বেনোর বল স্পিন করে সুব্বা-রাও-এর প্যাডে লেগে উইকেটে গিয়ে ধাক্কা মারল।

পাঁচ উইকেটে ১৬৩ রান। জয়লাভ করতে হলে ইংল্যাণ্ডকে ৮৫ মিনিটে ৯০ রান করতে হবে। ইংল্যাণ্ডের সম্মুখে এখন সমূহ বিপদ। ব্যাটস্‌ম্যান বলতে এখন বাকি মাত্র দু-জন—ব্যারিংটেন আর মারে। অস্ট্রেলিয়ারও দুর্ভাগ্য দেখা দিল। ম্যাককের পায়ের একটা মাংস-পেশী হঠাৎ ছিঁড়ে গেল, মাটিতে শুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। বেনো চোখে অন্ধকার দেখলেন। একদিক দিয়ে ব্যাটস্‌ম্যানকে রান করতে না দিয়ে আটকিয়ে রাখার জন্য ম্যককে-কে অত্যন্ত প্রয়োজন। ম্যাককের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর, এত সাঙ্ঘাতিক যে এই ম্যাচের পর আর পঞ্চম টেস্ট পর্যন্ত কোন খেলায় যোগ দিতে পারেন নি।

ম্যাককে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মাঠ থেকে চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এলেন। সেই খোঁড়া পা নিয়েই আবার তিনি বল দিতে লাগলেন।

ইংল্যাণ্ডের এখন একমাত্র ভরসা ব্যারিংটন। ব্যারিংটন একবার দাঁড়িয়ে গেলে তাঁকে আউট করা অত্যন্ত কঠিন। ম্যাককের একটা বল তীব্র বেগে ব্রেক খেয়ে ব্যারিংটনের প্যাডে লাগল। ব্যারিংটন এল. বি. ডব্লু. আউট।

এবার ইংল্যাণ্ড জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে কোনরকমে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগল। কোনরকমে কালক্ষেপ করে উইকেট বাঁচিয়ে রেখে ড্র করার চেষ্টা করা। কোথায় ১৫০ রানে দুই উইকেট, আর এখন পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা!

ব্যারিংটন আউট হয়ে যেতেই অস্ট্রেলিয়ার বুকে দারুণ শক্তি ফিরে এল। জয়োন্মুখ হয়ে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে খেলতে লাগল। স্লিপে ফীল্ড করায় সিম্পসন অদ্বিতীয়। স্লিপে সুন্দর দুটি ক্যাচ নিলেন সিম্পসন। বেনোর বলে সিম্পসনের হাতে আউট হলেন মারে। বেনোর আর এক বলে অ্যালেনের একটা ক্যাচ উইকেট-কীপার গ্রাউটের হাতে লেগে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, সিম্পসন ডাইভ করে মাটির থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে বলটি ক্যাচ ধরলেন।

ট্রুম্যান জোরে ব্যাট চালাতে গিয়ে সিম্পসনের বলে আউট হলেন। খেলা শেষ হতে তখনও আধ ঘণ্টা বাকি। স্ট্যাথাম আর ফ্ল্যাভেল আর মাটি থেকে ব্যাট তুলছেন না।

বেনো আনলেন ডেভিডসনকে। ডেভিডসনের প্রথম বলই স্ট্যাথামের অফ-স্টাম্প ছিটকিয়ে ফেলে দিল।

কোথায় অবশ্যম্ভাবী পরাজয়, আর কোথায় চিত্ত-চাঞ্চল্যকর জয়!

অস্ট্রেলিয়া এই টেস্টে জয়লাভ করে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে রইল। শেষ দুটি টেস্ট ম্যাচ হল ড্র। এই ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের জয়ের ফলেই অস্ট্রেলিয়া 'অ্যাশেস' নিয়ে দেশে ফিরতে পেরেছিল।

সফল স্বপ্ন

বার-বার তিনবার নয়, ছয়বার টম সিম্পসন চেষ্টা করেছেন বাইসাইকেল রেসে পেশাদারদের মধ্যে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হবেন, ছয়বারই তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে। ১৯৫৯ সন থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সাইকেলের পেশাদারি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ রেসের ইতিহাস এই। ১৯৫৯ সনেই সিম্পসন প্রথম পেশদার হন, সে বছর এই প্রতিযোগিতায় হলেন চতুর্থ, ১৯৬৪ সনেও চতুর্থ। বাকি চার বছরে পিছিয়ে-পড়া দলের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯৬৫ সনের সাইকেল রেসের মরশুম শুরু হওয়ার সময় সিম্পসন শুধু এই কথাই ভাবছিলেন। ছয় বছর ধরে পৃথিবীর সেরা সাইক্লিস্টদের সঙ্গে লড়াই করার পর তখন আর তাঁর বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হওয়ার মত দম এবং শক্তি আছে কি ?

১৯৬৫ সনের মরশুম কিন্তু সিম্পসন ভালভাবে শুরু করতে পারলেন না। এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ডের একটি রেসেই যা প্রথম হলেন—সমস্ত প্রতিযোগীই সেখানে ইংরেজ—সেটা এমন কিছু কৃতিত্বের কথা নয়, কারণ গত তিন বছর ধরে তিনি ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ পেশাদারি সাইক্লিস্ট।

ইংল্যাণ্ডের বাইরে মে মাসে বোর্দো থেকে প্যারিস পর্যন্ত সাইকেল রেসে হলেন তৃতীয়। তারপর এল 'ফ্রান্স প্রদক্ষিণ' রেস। পাহাড়ি রাস্তায় সাইকেল ছুটিয়ে যাওয়ার সময় এক দুর্ঘটনা, সাইকেল নিয়ে ছিটকিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। হাত পা ছড়ে কেটে গেল, বাঁ হাত গেল মচকিয়ে। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে আবার সাইকেল চালাতে লাগলেন। সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা, বাঁ হাত পেকে ফুলে উঠছে, সেই হাত দিয়ে হ্যাণ্ডেল ঠিকমত ধরতে পারছেন না—তবু হাল ছাড়বার পাত্র সিম্পসন নন। যতই সময় যায়, ততই হাতের বেদনা বেড়ে ওঠে—

এইভাবে তিনি পাঁচদিন ধরে সাইকেল চালালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তার তাঁর এই অবস্থা দেখে আর সাইকেল চালাতে দিলেন না। গায়ের জোরে তাঁকে সাইকেল থেকে নামিয়ে হেলিকপ্টারে করে সোজা হাস-পাতালে পাঠিয়ে দিলেন। প্যারিসের ডাক্তারেরা দেখে-শুনে জানালেন যে আর একদিনও দেরি হলে তাঁর বাঁ হাত কেটে বাদ দিতে হত।

অসুখ থেকে সেরে উঠতে সময় লাগল না; কিন্তু পূর্বের শক্তি ফিরে পেতেই যা দেরি হতে লাগল। জুলাই ও অগাস্ট মাসে কয়েকটি সাইকেল প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন, কিন্তু কোন প্রতিযোগিতাতেই একটুও ভাল ফলাফল দেখাতে পারলেন না।

সেই অবস্থায় ব্রিটিশ সাইক্লিস্টদের দল নিয়ে এলেন স্পেনে, স্থান সেবাস্তিয়ানে।

এই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় আর একজন সিম্পসনের সঙ্গে একত্রে নাটকীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি হয়েছেন এক জার্মান—নাম রুডি আলটিগ। এই ১৯৬৫ সনে এই দুজনের ভাগ্যের ওপর যেন একই গ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল। 'স্পেন পর্যটন' প্রতিযোগিতায় রুডি আলটিগ আরও মারাত্মক দুর্ঘটনায় আহত হন এবং তিন মাস হাঁটতে পারেন নি, জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্তও তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতেন।

কে এই বছর পেশাদারি সাইক্লিস্টদের মধ্যে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হবেন—এই নিয়ে কম জল্পনা-কল্পনা চলে নি। গতবারের চ্যাম্পিয়ান হল্যাণ্ডের য়ান য়ানসেন্স্ এ বছর এই প্রতিযোগিতায় যোগ না দেওয়াতেই কে চ্যাম্পিয়ান হতে পারেন বুঝতে পারা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া ইটালির চ্যাম্পিয়ান দুই সাইক্লিস্ট গত বছরের এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ভিটোরিও আসেনি এবং এই বছরে ফ্রান্স পর্যটনের প্রথম স্থান অধিকারী ফেলেসি গিমোন্দিও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি। এই তিনজনের অনুপস্থিতিতে প্রতিযোগিতার জৌলুস একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রতিভাধর সাইক্লিস্টের সংখ্যা খুব কম ছিল না।

এই ধরনের বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় দলের সংগঠন ও দলের সমর্থক জয়লাভে অত্যন্ত বেশি সাহায্য করে। ব্যক্তিগত গৌরব অর্জনের মোহ থাকে নিশ্চয়ই, কিন্তু দেশের গৌরব সবচেয়ে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। সেইজন্য একটি দেশেরপ্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাইক্লিস্টকে প্রথম হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রথম থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে সেইমত চলেন। এই প্রতিযোগীদের কাজ হয় ভিড় বাড়ানো এবং অন্য দেশের কোন প্রতিযোগী প্রথম হওয়ার চেষ্টা করলেই তার পিছু ধাওয়া করে চারদিক দিয়ে ঘিরে তাঁর গতিবেগ হ্রাস করা। সেই দিক দিয়ে সিম্পসনের ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন। ব্রিটেনের অপর পাঁচজন প্রতিযোগী—মাইকেল রাইট, অ্যালান র‍্যামস্‌বটম, ভিন ডেনসন, ব্যারি হোরান এবং কীথ বাটলার সিম্পসনকেই তাঁদের নেতা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের প্রতিযোগীদের মধ্যে সে-সম্ভাব ছিল না। ইটালি এবং হল্যাণ্ড পূর্ণশক্তিতে যোগ না দেওয়ার ফলে ফ্রান্স কিংবা বেলজিয়ামের সাইক্লিস্টদের মধ্যে জয়লাভের সম্ভাবনা বেশি। বেলজিয়ামের চ্যাম্পিয়ান সাইক্লিস্ট রিক ভ্যান লুই দুবার বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন, কিন্তু এই বছর অপর দুজন বেলজিয়ান ওয়ার্ড সেল্‌স্‌ ও ভ্যান ডের কারখোভ বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান হওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। আর ফ্রান্সের বেলায় হয়েছে দুই প্রতিভাধর সাইক্লিস্ট জ্যাকস আকেয়ো-তিন ও রেঁমো পুলিদোর-এর মধ্যে তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষ—অপরকে চ্যাম্পিয়ান না হতে দেওয়ার জন্য নিজের চরম ক্ষতিতেও আপত্তি নেই।

তবুও প্রতিযোগীর সংখ্যা কম নয়, ছিয়ানব্বই। বেলজিয়াম থেকে এসেছেন রিক ভ্যান লুই, সেলস, ভ্যান ডের কারখোভ, রোজার সোয়ের্টস, ফ্রান্স থেকে আঁকোয়েতিন, পুলিদোর, জঁ স্তাব্লিনস্কি ; জার্মানি থেকে কার্ল হাইনৎস্‌ কুণ্ডে ও রুডি আলটিগ ; হল্যাণ্ড থেকে পোস্ট ও ডেন হার্টোগ ; ইটালি থেকে বালমানিয়ন, মিয়ালি, জিলিওলি; সুইজারল্যাণ্ডের বিঙ্গেলি, স্পেনের এলোর্জো, মাঙ্গনেক, উরিওনা এবং আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে শে এলিয়ট।

একশো ছেষট্টি মাইল সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা। এই দূরত্বটি চোদ্দটি ল্যাপ, রাইণ্ড বা চক্রে বিভক্ত এবং এক এক ল্যাপের দূরত্ব প্রায় পৌনে বারো মাইল। স্যান সেবাস্তিয়ান থেকে সাত মাইল দূরে লাসার্তে শহরতলি এই প্রতিযোগিতার ক্রীড়াভূমি। এই প্রতিযোগিতার কঠিন অংশ হল হেরনানি থেকে প্রায় দুই মাইল পাহাড়ে আরোহণ এবং তারপর প্রায় তিন মাইল ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে একেবারে লাসার্তেতে এসে পৌঁছনো। পাহাড়ে এই ওঠা-নামাই প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫। রবিবার।

পেশাদারী সাইক্লিস্টদের বিশ্ব-প্রতিযোগিতার দিন।

এক সপ্তাহ আগে থেকেই শুরু হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। আকাশ সব সময়ে মেঘাচ্ছন্ন, কখনো প্রবল বর্ষণ, কখনো বা ঝির-ঝির করে জলধারা—এরই মাঝে হঠাৎ মেঘের ফাঁক থেকে সূর্যদেব মুখ দেখাচ্ছেন। পথঘাটের অবস্থা শুধু খারাপই নয়, রেসের পক্ষে বেশ মারাত্মক। রেসের দিনেও আবহাওয়ার এতটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিন্তু দর্শকদের উৎসাহ স্তিমিত করতে পারে নি। বারো মাইল পথ জুড়ে রাস্তার দুধারে লক্ষ লক্ষ দর্শক রেন-কোট গায়ে দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে রেস শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই ভিড় জমিয়ে বসে আছেন। স্পেনের বাইরে থেকেই এসেছেন সবচেয়ে বেশি দর্শক। মাঝে টেলিভিশন বসানো হয়েছে, যাতে দর্শকেরা একই জায়গায় বসে থেকে প্রতিযোগিতার প্রতিটি মুহূর্ত অনুভব করতে পারেন।

রেস শুরু হওয়ার ঠিক আগেই যেন প্রকৃতি দেবী একবার মুখ তুলে চাইলেন। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি ধরল, সূর্যের মুখও দেখা গেল। ছিয়ানব্বই জন প্রতিযোগী তাঁদের সাইকেল নিয়ে স্টার্টিং লাইনে এসে দাঁড়ালেন।

গতবারের বিশ্বজয়ী য়ান য়ানসেনস্ রেসের প্রথমেই সকলকে পিছিয়ে সজোরে সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত সকলের চ্যালেঞ্জ তুচ্ছ করে প্রথম হন। এবার জার্মানির কুণ্ডে য়ানসেনসের নীতি গ্রহণ করে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বেগে অগ্রসর হলেন।

স্পেনের অনুষ্ঠিত রেসে স্পেনের সাইক্লিস্টরা পিছিয়ে থাকলে চলবে কেন? তাঁরা সকলে আক্রমণ করলেন কুণ্ডেকে। পিছু-পিছু ধাওয়া করে কুণ্ডেকে ধরে ফেললেন। এই দলে যোগ দিলেন হোবেন, সোয়েৰ্টস, হার্টোগ, পোস্ট, বিঙ্গেলি, বালমানিয়ন ও মিয়ালি। মুখ্য দলকে পিছিয়ে তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন। প্রথম ল্যাপে তাঁরা মুখ্য দল থেকে সময়ের হিসেবে এক মিনিট অগ্রবর্তী।

দ্বিতীয় ল্যাপ শেষ হওয়ার পর সিম্পসন, আলটিগ আর এলোর্জা মনে করলেন গতিক বিশেষ সুবিধের নয়। মুখ্য দলের ভিড়ের মধ্যে থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়ত এগিয়ে যেতেই পারবেন না, সকলে হয়ত চেপে রাখবার চেষ্টা করবে; সুতরাং সময় থাকতে ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

ঠিক সেই সময়ে আবার প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সিম্পসন এই বৃষ্টির মধ্যেই মুখ্য দলকে ছেড়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গ নিলেন আলটিগ আর এলোর্জা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে একত্র হলেন। সাইকেলের গতিবেগ বাড়তে লাগল, কিন্তু দলও বিশেষ পিছিয়ে রইল না। তাঁরাও সমান তালে গতিবেগ বৃদ্ধি করলেন। ছয় ল্যাপ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে দুই দলের মধ্যে সময়ের পার্থক্য মাত্র আড়াই মিনিট।

মুখ্য দল থেকে এবার ছয় জন সাইক্লিস্ট সজোরে বেরিয়ে এসে অগ্রবর্তী দলের পিছনে তাড়া করলেন। এই নতুন দলের মধ্যে সেলস্, কেরখোভ এবং জঁা স্তাব্লিনস্কিকেই বেশি ভয় করতে লাগলেন সিম্পসন, আলটিগ এবং এলোর্জা। তাঁরা সেইজন্য তাঁদের গতিবেগ বাড়িয়ে তুললেন। আরো এক ল্যাপ গেল, দু ল্যাপ—অগ্রবর্তী দল পিছনের ছয় জনের দলের চেয়ে আড়াই মিনিট সময়ে তখনও অগ্রসর; মুখ্য দল আরও অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সেই ছয়জনের দল অগ্রবর্তী দলকে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। সাইকেলের চাকায় যেন আগুন জ্বলতে লাগল। আইরিশ সাইক্লিস্ট শে এলিয়টের টায়ার ফেটে গেল। এলিয়টের এই দুরবস্থা দেখে অন্য পাঁচজন আর জোরে চালাতে সাহস করলেন না। এবং গতিবেগ একটু কমতেই মুখ্য দল তাঁদের ধরে ফেলল।

অগ্রবর্তী দলেও দেখা দিল বিপর্যয়। দশ ল্যাপের মাথায় স্পেনের দুজন সাইক্লিস্ট টায়ার ফুটো হওয়ার জন্য বসে পড়লেন। অন্যান্য সাইক্লিস্টরা এতক্ষণ সজোরে সাইকেল চালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

হঠাৎ পথের দু-ধার থেকে চিৎকার ভেসে উঠল—সিম্পসন! আলটিগ!

সিম্পসন এবং আলটিগ অগ্রবর্তী দল থেকে হঠাৎ ছিটকিয়ে এগিয়ে গেছেন। অগ্রবর্তী দল থেকে তাঁরা এগিয়ে গেছেন এক মিনিট।

বারো ল্যাপের শেষে সিম্পসন এবং আলটিগ প্রায় গা ঘেঁসে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সিম্পসন আর ফুটখানেক মাত্র এগিয়ে। ঠিক তাঁদের পিছন-পিছন ছুটে আসছিলেন হার্টোগ, সোয়েৰ্টস এবং পোস্ট, কিন্তু তাঁরাও প্রায় দেড় মিনিট সময় পিছিয়ে। আর সকলে ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছিলেন। এবার আসল প্রতিযোগিতা শুরু হল এই পাঁচজনের মধ্যে, এবং ঠিক কথা বলতে গেলে মাত্র দুইজন—সিম্পসন ও আলটিগের মধ্যে।

তের ল্যাপ শেষ হয়ে গেল, সিম্পসন ও আলটিগ তখনও প্রায় সমান-সমান। তাঁদের ঠিক পিছন-পিছন তিন মিনিট পরে আসছেন হার্টোগ, সোয়ের্টস এবং পোস্ট। মুখ্য দল বারো মিনিট পিছিয়ে।

শেষ ল্যাপে মরণ-পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন সিম্পসন ও আলটিগ। হেরনানি থেকে উঁচু পাহাড়ি পথ বেয়ে ছুটে চললেন। দুজনের চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ, দুজনেই দাঁতে দাঁত চেপে প্যাডেল ঘুরিয়ে চলেছেন। সিম্পসন তখনও সামান্য একটু এগিয়ে। পাহাড়ের ঢালু উৎরাই পথেও তাঁরা দুজন প্যাডেল থামালেন না, ঘুরে শেষে সোজা পথে এসে পৌঁছুনো-মাত্র চল্লিশ হাজার দর্শকের উৎফুল্ল হর্ষধ্বনি তাঁদের অভিনন্দিত করল।

শেষ চারশো গজেও আলটিগ সিম্পসনের সঙ্গ ছাড়েন নি, সমানে যুঝে গেছেন। দর্শকদল দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুজনকে উৎসাহ দিচ্ছেন। 'সিম্পসন', 'সিম্পসন' এবং 'আলটিগ' 'আলটিগ' চিৎকারে সারা পথ তোলপাড়।

শেষ দুশো গজের মাথায় সিম্পসন তাঁর শেষ সঞ্চিত শক্তি নিঃশেষ করে দিলেন প্যাডেলের ওপর। আলটিগের আর কোন শক্তি ছিল না

যে তিনি সিম্পসনকে আটকাতে পারেন। সিম্পসন একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় পনের ফুট এগিয়ে প্রথম হলেন সিম্পসন, আলটিগ হলেন দ্বিতীয়। এবং তৃতীয় হলেন সোয়েটস।

তখনও ঝম-ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু দর্শকদের আনন্দ-উদ্দীপনার ওপর এই অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা এতটুকু দাগ কাটতে পারল না।

ফুটবলের ট্র্যাজেডি

কোন ভূমিকম্প নয়, বন্যা নয়, অগ্ন্যুৎপাতও নয়।

শুধু একটা ফুটবল খেলা। অথচ যত নর-নারী-শিশুর প্রাণহানি হল, যত লোক আহত হল বা চিরকালের জন্য পঙ্গু হল—তা বোধহয় কোনও ভূমিকম্প বা বন্যাতেও হয় না। হাজার হাজার লোকের আনন্দ এক নিমেষে পরিণত হল মর্মন্তুদ বিষাদে, হাজার হাজার দর্শকের হর্ষধ্বনি রূপান্তরিত হল আর্তনাদে।

কিছুক্ষণের এক বিভীষিকা। হাজার নর-নারী-শিশুর বাঁচবার আকুল প্রয়াস, একটু বাতাসের জন্য করুণাময় ভগবানের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা—তারপর শ্মশান, শ্মশানের নীরবতা।

যাঁরা যাঁরা সেই প্রলয়ে মৃত্যুর তাণ্ডব নর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন, আজও এতদিন পরে সেই কথাটা স্মরণে এলে শিউরে ওঠেন। সেদিন তাঁদের আবার নবজন্ম।

১৯৬৪ সনের ২৪শে মে সেই প্রলয়ঙ্কর দিন।

সেই রবিবার নির্দিষ্ট হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার দুই দেশ পেরু এবং আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের মধ্যে ফুটবল খেলা। এই খেলাতে যে দেশ জয়লাভ করবে, তারাই টোকিও ওলিম্পিকে দক্ষিণ আমেরিকাকে প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং এই ফুটবল খেলার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং দর্শকেরা এই খেলা দেখার জন্য অধীর এবং উত্তেজিত।

পেরুর রাজধানী লিমার ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে এই খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যান্য দেশের মত দক্ষিণ আমেরিকাতেও ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা। এই খেলা দেখার জন্য বহু দূর দূরান্তর থেকে লোকে ট্রেনে, গাড়িতে, সাইকেলে করে লিমাতে এসে উপস্থিত হয়েছে। অনেক দরিদ্র

শ্রমিক কয়েক সপ্তাহের রোজগার জমিয়ে টিকিট কেনার অর্থ সংগ্রহ করেছে। অনেকে চড়ুইভাতি করার মত মন নিয়ে সপরিবারে খেলা দেখতে এসেছে। খেলা শুরু হওয়ার অনেক, অনেক আগে পঞ্চাশ হাজার টিকেট বিক্রি হয়ে গেল। স্টেডিয়াম দর্শকে একেবারে পরিপূর্ণ। স্টেডিয়ামের বাইরেও প্রায় লাখখানেক লোক ভিড় করে আছে।

সেদিন আকাশ অন্ধকার। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কুয়াসা উঠে লিমা নগরীটিকে ঢেকে ফেলেছে।

কিন্তু স্টেডিয়ামে এই কুয়াসাচ্ছন্ন অবস্থা নয়। দর্শকদল আনন্দে উদ্বেল। এক-একটি দল এক-এক জায়গায় সমবেত হয়ে হৈ-হল্লা করছে। অনেকে এনেছে বাজনা। সেই বাজনা বাজিয়ে গান গেয়ে স্টেডিয়াম সরগরম করে রেখেছে।

দর্শকদের বসবার জায়গা ইস্পাতের তারের জাল দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে পুলিশ বেটন, পিস্তল এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল নিয়ে সার বেঁধে বসেছে। ফুটবল খেলার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট। পেরুর দর্শকেরা স্বভাবতই বদরাগী—মতে না মিললেই তারা মাঠে ঢুকে পড়ে রেফারি, লাইনসম্যান কিংবা খেলোয়াড়দের আক্রমণ করার চেষ্টা করে। জীবনের জাঁতাকলের থেকে ফুটবল খেলায় ক্ষণিক মুক্তি পায় বলেই তারা এত অধৈর্য। ফুটবল খেলায় নিজের দলের জয়লাভ তাদের কাছে ব্যক্তিগত সম্মান, গৌরব এবং গর্ব।

বিকেল তিনটের সময় খেলা আরম্ভ হল। আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়েরা বলের সুন্দর আদান-প্রদান করে খেলতে লাগল, পেরুর খেলোয়াড়েরাও তাদের সঙ্গে সমান তালে যুঝতে লাগল। স্টেডিয়ামে শুধুই চিৎকার আর হট্টগোল। প্রথমার্ধ শেষ হল গোলশূন্য অবস্থায়।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হল। এবার দর্শক মহল অত্যন্ত উত্তেজিত, আরও বেশি মারমুখী। তেইশ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনা হঠাৎ একটি গোল করে অগ্রবর্তী হল। পেরু এবার মরিয়া হয়ে আক্রমণ করতে লাগল। দর্শকেরা চিৎকার করে তাদের বাহবা দিতে লাগল। বারো মিনিট পরে পেরু একটি গোল দিল, কিন্তু উরুগুয়ের রেফারি পাজোস

সেই গোলটি বাতিল করে দিলেন। জানালেন যে গোল হওয়ার আগেই তিনি পেরুর বিরুদ্ধে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন।

গোল বাতিল করে দেওয়ায় পেরুর দর্শকেরা রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ল। হাজার হাজার বোতল, ইঁট-পাটকেল মাঠের মধ্যে তারা ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। "বোম্বা" (বোমা) নামে একটি দর্শক নয় ফুট উঁচু সেই ইস্পাতের জাল বেয়ে উঠে মাঠের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে রেফারি পাজোসকে মারবার জন্য তাড়া করল। পুলিশ ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল।

দর্শকদের ক্রমান্বয়ে উত্তেজিত হতে দেখে রেফারি খেলা বন্ধ করে দিলেন। খেলা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে দর্শকদের রাগ আরও বেড়ে গেল। উত্তর দিকের স্টেডিয়াম থেকে অসংখ্য দর্শক সীট থেকে নেমে তারের বেড়া বেয়ে ওপরে উঠে মাঠে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। পুলিশ বেটন দিয়ে হাতে পায়ে মেরে তাদের বাধা দিতে লাগল। তারের বেড়া ডিঙিয়ে যেতে না পেয়ে তারা এবার মাটিতে বসে পা দিয়ে একসঙ্গে তারের জাল ফুটো করার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকটা গর্ত করে তারা দলে-দলে মাঠে ঢুকে পড়ল। তাদের সঙ্গে পুলিশ এবং পুলিশের কুকুরের লড়াই শুরু হয়ে গেল। এদিকে স্টেডিয়ামে একদল লোক একটা দেয়াল ভেঙে তার ইঁট পুলিশদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

রক্তপাত বন্ধ করার জন্য পুলিশ এবারে তারের বেড়ার ধারে কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে লাগল। বাতাসে সেই গ্যাস উত্তর দিকের দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে পড়ল। চোখ মুখ জ্বালা করতে থাকায় দর্শকেরা একটু শান্ত হল, কিন্তু এবারে ওই স্টেডিয়ামের ভিতরে মুহুর্মুহু কাঁদানে গ্যাসের শেল পড়তে লাগল।

হাজার হাজার লোকের দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, গ্যাসের ঝাঁঝে তারা তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চোখ বুজে অন্ধকারে হাতড়িয়ে তারা একটু ফাঁকা জায়গার সন্ধান করতে লাগল, কিন্তু কোথায় যাবে তারা? চারদিকে শুধু মানুষ আর মানুষ—মানুষের দেয়াল।

হঠাৎ জনতার মাঝে আলোড়ন উঠল। তাদের বাঁচতে হবে, এই বিষাক্ত জায়গা থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের বাঁচতে হবে। সকলে এক-সঙ্গে স্টেডিয়াম থেকে প্রাণের ভয়ে ছুটতে লাগল। সকলের লক্ষ্য তখন বাইরে বেরুনোর দরজা। কিন্তু সেই দরজা এক সুড়ঙ্গের মত মাঠের দিকে চোদ্দ ফুট চওড়া, বাইরের দিকে মাত্র দশ ফুট।

পাগলের মত লোকে সেই গেটের দিকে হুড়মুড় করে দৌড়তে লাগল। কত নরনারী, শিশু ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গেল, ছুটন্ত লোকের পায়ের তলায় পড়ে তারা পিষে মারা গেল। তাদের মৃত্যু-আর্তনাদ চারদিকের চিৎকারে গোলমালে ঢাকা পড়ে গেল। লোকে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটতে লাগল।

কিন্তু তারপর তারা আর-এক সর্বনেশে আতঙ্কের সম্মুখীন হল। দুটি মাত্র লোহার গেট—গেটদুটি তালাবন্ধ করে গেটকিপাররা শেষ সময়ে খেলাটুকু দেখতে গিয়েছিল। বন্ধ দরজা দেখে সম্মুখের লোকেরা আবার ফিরে যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু পিছনের জনতার চাপে তারা আর এগোতে পারল না। তাদের অনুনয়, অনুরোধ, কাতর ক্রন্দন পিছন থেকে ছুটে আসা লোকের চিৎকারে শোনা গেল না। পিছন থেকে শুধু ঝাকে-ঝাঁকে লোক ছুটে আসতে লাগল। অর্ধেক লোক চাপের চোটে দমবন্ধ হয়ে মারা গেল, অর্ধেক লোক পায়ের তলায় পিষে গেল। চারদিকে শুধু লোকের আর্তধ্বনি।

ভিড়ের চাপে কত লোক জনতার মাথার ওপরে উঠে গেল। সেই চাপে লোহার দরজা ফেটে ভেঙে গেল। সামনের লোকেরা অনেকে আহত হল, অনেকে সেই ভাঙা দরজা দিয়ে কোনরকমে বেরিয়ে যেতে পারল। কত লোক হত এবং আহত হল, হাত-পা-ভাঙা অবস্থায় মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল।

এই গোলমাল ছড়িয়ে পড়ল মাঠ থেকে রাস্তায়। একদল দুর্বৃত্ত পুলিশদের লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে লাগল, মোটরগাড়িতে আগুন লাগাতে শুরু করল। অফিস পুড়িয়ে, দোকান লুটপাট করে জ্বালিয়ে আর এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে তুলল।

কত লোক মারা গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। পথের ধারে শুধু সার-সার পড়ে ছিল মৃতদেহ। কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কত পরিবারের শুধু একজন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল। আহতের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেকের প্রাণ বেঁচেছে, কিন্তু দিয়ে আসতে হয়েছে হাত এবং পা।

মৃতের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশো, আহত অন্তত পাঁচ হাজার। সঠিক সরকারী খবর পাওয়া যায় নি ; কিন্তু একথা সত্য যে ফুটবল খেলার ইতিহাসে কেন, কোন ভূমিকম্প বা বন্যাতেও এরকম প্রাণহানি এরকম অর্থহানি হয় না।

কলঙ্কমোচন

নিজেকে মস্ত বড় অপরাধী মনে করে লণ্ডন অলিম্পিক থেকে ফিরে এসেছিলেন আর্থার উইন্ট।

অথচ লণ্ডন অলিম্পিকে তাঁর একক কৃতিত্ব কম নয়। অলিম্পিকে প্রথমবার যোগদানের সুযোগ পেয়ে একটি দৌড়ে প্রথম ও একটি দৌড়ে দ্বিতীয় হওয়া কয়জনের ভাগ্যে সম্ভব হয়ে থাকে? ১৯৪৮ সনের লণ্ডন অলিম্পিকে আর্থার উইন্ট চারশো মিটার দৌড়ে পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক এবং আটশো মিটার দৌড়ে রৌপ্যপদক।

কিন্তু এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না যে ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে জামাইকার অবধারিত জয়লাভ শুধু তাঁর জন্যই ব্যর্থ হয়েছে। দেশের সুনাম রাখতেই শুধু যে তিনি অপারগ হয়েছেন—তা-ই নয়, তাঁর নিজের অপর তিনজন সহ-প্রতিযোগীকেও জয়লাভে বঞ্চিত করেছেন।

১৯৪৮ সনের লণ্ডন অলিম্পিকের পর বেদনায় এবং লজ্জায় মর্মাহত হয়ে উইন্ট দৌড়োনো একেবারে ছেড়ে দিলেন। এই কলঙ্কের অপনয়ন করতে না পারলে আর দৌড়োনো নয়। কিন্তু···কিন্তু আর কী করে তা সম্ভব?

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ছোট্ট একটি দ্বীপ জামাইকা। এই রৌদ্রস্নাত দ্বীপেই আর্থার উইন্টের জন্ম। এখানেই তিনি মনের আনন্দে দৌড়োতেন; কিন্তু তিনি যে কোনদিন একজন বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর হবেন, তা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি।

১৯৪৪ সনে তিনি জামাইকা থেকে এলেন ইংল্যাণ্ডে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে, যদিও একেবারে শেষ মুখে। তিনি রয়েল এয়ার ফোর্সে যোগদান করে ফাইটার-পাইলট হলেন। কিছুদিন পরে যুদ্ধ থেমে গেল, আর অনেকের মতই তিনিও চাকরি হারিয়ে হয়ে পড়লেন বেকার।

ভবিষ্যৎ অন্ন-সংস্থানের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডে থেকেই ডাক্তারি পড়তে লাগলেন। ছাত্র অবস্থাতেই তিনি ইংল্যাণ্ডে দৌড়ের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেন।

১৯৪৮ সনে যখন লণ্ডনে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়, তখন ইংল্যাণ্ডের নির্বাচক মণ্ডলী ব্রিটেনকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আর্থার উইন্টকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু এই অলিম্পিকে পৃথকভাবে জামাইকাও যোগদান করেছিল। সুতরাং তিনি ব্রিটেনের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে জামাইকার প্রতিনিধি হয়ে অলিম্পিকে যোগ দিলেন।

উইন্টের বয়স তখন আঠাশ বছর। দৌড়িয়ে হিসেবে এই বয়স একটু বেশির দিকে। তিনি যোগ দিয়েছিলেন চারশো, আটশো মিটার এবং ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে। অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগীর বয়স তাঁর বয়সের তুলনায় অনেক কম। এত বেশি বয়সে পৃথিবীর বাছাই দৌড়বীরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেকোন পদকই লাভ করা তাঁর পক্ষে ছিল শুধু কঠিন নয়, একরকম অসম্ভব। অন্তত বিশেষজ্ঞদের অভিমত ছিল তাই।

৮০০ মিটার দৌড়ে তখন বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী আমেরিকার ম্যাল হুইটফীল্ড। অলিম্পিকের এই প্রতিযোগিতায় হুইটফীল্ডই হলেন প্রথম, দ্বিতীয় হলেন উইন্ট—মাত্র এক পা পিছিয়ে। দুজনেই ওলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করলেন।

এই দৌড়ের ফলাফল দেখে প্রথমে একটু দমে গেলেন উইন্ট। দুদিন পরেই চারশো মিটার দৌড়—এই প্রতিযোগিতায় তাঁর সাফল্য সুদূর পরাহত, কারণ এই দৌড়ের প্রতিযোগীদের মাঝে আছেন বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী জামাইকারই হার্বার্ট ম্যাক্‌কেনলি। তাছাড়া আছেন আটশো মিটার দৌড়ে বিজয়ী হুইটফীল্ড। এঁদের দুজনের সঙ্গে দৌড়ে প্রথম হওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন তাঁর দেশের বেশি পদক-লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। এই দৌড়ে তৃতীয় হতে পারলেও জামাইকার ভাগে একটি বেশি পদক আসবে।

উইন্টের দৌড়ের সাফল্যর মূলে ছিল তাঁর উচ্চতা এবং সুদীর্ঘ

পদক্ষেপ। সাড়ে ছ-ফুট লম্বা, এক-এক পদক্ষেপে অনেকখানি যেতে পারতেন তিনি।

চারশো মিটার দৌড় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান ম্যাক্‌কেনলি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সকলের আগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। হুইটফীল্ড ঠিক তার পরে, এবং তাঁরও পরে উইণ্ট। তুশো মিটার দৌড় হলে পর দেখা গেল যে ম্যাক্‌কেনলি উইণ্টের চেয়ে প্রায় সাত গজ এগিয়ে আছেন।

প্রাণপণ শক্তিতে সুদীর্ঘ পদক্ষেপে উইণ্ট অগ্রসর হলেন। হুইট-ফীল্ডকে অতিক্রম করলেন চোখের নিমেষে, তার পরেই ধরে ফেললেন ম্যাক্‌কেনলিকে। পঁচিশ গজ বাকি থাকতে উইণ্ট তাঁর সর্বশক্তি একত্রিত করে তীব্রবেগে ধাবিত হলেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বুক দিয়ে ফিতে ছিঁড়ে তিনি শেষ সীমানা অতিক্রম করলেন। দ্বিতীয় হলেন তাঁরই স্বদেশবাসী বিশ্ব-রেকর্ডের অধিকারী ম্যাক্‌কেনলি, তৃতীয় হলেন আমেরিকার হুইটফীল্ড।

তার তুদিন পরেই ৪ × ৪০০ মিটার রিলে রেস। চারশো মিটার দৌড়ের ফলাফল দেখে এই প্রতিযোগিতায় জামাইকার অবধারিত সাফল্য সম্বন্ধে সকলে একরকম নিঃসন্দেহ হলেন। জামাইকার দলে শুধু তুই উদীয়মান দৌড়বীর রোড্‌েন এবং লেইসিং নন, চারশো মিটার দৌড়ের বিজয়ী প্রথম তুজন উইণ্ট এবং ম্যাক্‌কেনলিও আছেন।

এই প্রতিযোগিতায় জামাইকার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা। এই দলের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরদের মধ্যে আছেন আটশো মিটারে তৃতীয় স্থান অধিকারী হুইটফীল্ড এবং চারশো মিটার হার্ডলস রেস বিজয়ী কোকরান।

এই প্রতিযোগিতা চার ল্যাপে দৌড় হয়, এক-এক ল্যাপ চারশো মিটার। এক-এক ল্যাপ এক-একজন প্রতিযোগী দৌড়ন—পূর্ববর্তী প্রতিযোগীর কাছ থেকে পরের প্রতিযোগীকে বেটন নিয়ে দৌড়তে হয়।

প্রথম তুই ল্যাপে তুই দলই সমান সমান। তৃতীয় ল্যাপে জামাইকার

পক্ষে দৌড়বেন উইণ্ট ও আমেরিকার পক্ষে কোকরান এবং শেষ ল্যাপে দুই দলের হয়ে দৌড়বেন যথাক্রমে ম্যাক্‌কেনলি আর হুইটফীল্ড।

এই তৃতীয় ল্যাপেই জয়-পরাজয় স্থির হয়ে যাবে, কারণ উইণ্ট যদি কোকরানকে বেশ কয়েক মিটারে পরাজিত করতে পারেন তো শেষ ল্যাপে ম্যাক্‌কেনলির জয়লাভ সহজ হয়ে পড়বে। সেইভাবে দৌড়লেন উইণ্ট। কোকরানকে পিছনে ফেলে তীব্র গতিতে এগিয়ে যেতে লাগলেন উইণ্ট। হঠাৎ দর্শক-মহলে উত্তেজনা দেখা গেল। উইণ্ট হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপরেই মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর উরুর মাংসপেশীতে টান লাগাতেই এই বিপত্তি।

জামাইকা রিলে রেস শেষ করতে পারল না। ম্যাক্‌কেনলি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। আমেরিকা অতি সহজেই প্রথম হল।

স্ট্রেচারে করে উইণ্টকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। কাউকে না জানিয়েই তিনি অলিম্পিক-ভূমি থেকে চলে গেলেন। এই রিলে রেসে জামাইকাকে অবধারিত জয়লাভ থেকে তিনিই বঞ্চিত করেছেন—এ কথা তিনি ভুলতে পারেন নি, নিজেকে ক্ষমাও করতে পারেন নি।

১৯৪৮ সনের অলিম্পিক শেষ হয়ে গেল। চলতে লাগল ১৯৫২ সনের হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের প্রস্তুতি। আর্থার উইণ্ট কিন্তু দৌড়-জগৎ থেকে একেবারে দূরে সরে গেলেন। কোন মাঠে তাঁকে দেখা গেল না, কোন প্রতিযোগিতায় আর উইণ্টের নাম শোনা গেল না। ডাক্তারি পাশ করে উইণ্ট ইংল্যাণ্ডেই ডাক্তারি করতে লাগলেন। যে কলঙ্কের কালিমা তিনি স্বহস্তে তাঁর দেশ জামাইকার ললাটে লেপন করেছেন, সেই কলঙ্কের অপনয়ন করতে না পারলে দেশের মুখ আর তিনি দেখবেন না।

কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব। পরের অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে ১৯৫২ সনে, তখন উইণ্টের বয়স হবে বত্রিশ। যৌবনোত্তীর্ণ বয়সে অনুশীলনরহিত অবস্থায় কারুর পক্ষে প্রতিযোগিতায় কোন স্থান পাওয়াই অসম্ভব।

১৯৫২ সনের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জন্য যখন দল

নির্বাচন হতে শুরু করল, তখনও পর্যন্ত উইন্ট কোনরকম উৎসাহ বোধ করলেন না। চার বছর ধরে কোনরকম অনুশীলন না করায় কিংবা কোনরকম প্রতিযোগিতায় যোগ না দেওয়ায় জামাইকার তরফ থেকেও তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এল না।

এই সময়ে লণ্ডনে এক স্বদেশবাসীর কাছ থেকে তিনি শুনলেন যে ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসের জন্য একজন ভাল দৌড়িয়ের অভাবে জামাইকার দল-গঠন সম্পূর্ণ হচ্ছে না। তাঁর কাছ থেকেই তিনি জানতে পারলেন যে ১৯৪৮ সনের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার তাঁর সেই তিন সহযোগী ম্যাক্‌কেনলি, রোডেন এবং লেইসিংও এই বছর অলিম্পিকে যোগ দিচ্ছেন।

উইন্টের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আবার সুযোগ এসেছে—এবার চেষ্টা করলে হয়ত ১৯৪৮ সনের কলঙ্ক মোচন সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এখন বয়স বেশি হয়েছে, দৌড়ের অনুশীলনও নেই—ডাক্তারি করার পর অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও পাওয়া যায় না।

তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে তিন বন্ধুকে চিঠি লিখে জানালেন যে, যদি তাঁরা রাজি হন তো তিনি এ-বছর তাঁদের সঙ্গে আবার রিলে রেসে দৌড়তে পারেন এবং তার জন্য অনুশীলন করতে পারেন।

চিঠি পেয়ে উচ্ছ্বসিত হলেন তিন বন্ধু। জামাইকার অলিম্পিক দল-নির্বাচকমণ্ডলীও আবার তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল চারশো মিটার এবং ৪×৪০০ মিটার দৌড়ে জামাইকাকে প্রতিনিধিত্ব করতে।

চার বছর উইন্ট এতটুকু অনুশীলন করেন নি। এখন প্রতিদিন যখনই একটু সময় মেলে তখনই তিনি অনুশীলন করে চলেন। চারশো মিটার দৌড়ে বিজয়ী হওয়ার বয়স আর তাঁর নেই, কিন্তু রিলে রেসে জয়লাভ করতে পারলেই তিনি মনে শান্তি ফিরে পাবেন।

শেষ পর্যন্ত জামাইকার অলিম্পিক দলের সঙ্গে তিনি হেলসিঙ্কিতে এসে উপস্থিত হলেন।

৮০০ মিটার দৌড়ে ১৯৪৮ সনের অলিম্পিক দৌড়ের পুনরাবৃত্তি। সেই হুইটফীল্ড হলেন প্রথম, দ্বিতীয় হলেন উইন্ট।

তারপর ৪০০ মিটার দৌড়। এবারে আর আগেকার ওলিম্পিকের পুনরাবৃত্তি ঘটল না। উইণ্ট এই দৌড়ে একেবারে ব্যর্থ হলেন, যদিও ১৯৪৮ সালের মতই দুজন জামাইকানই প্রথম এবং দ্বিতীয় হলেন। রোডেন হলেন প্রথম, দ্বিতীয় হলেন ম্যাক্‌কেনলি। উইণ্ট হলেন পঞ্চম, ষষ্ঠ হলেন হুইটফীল্ড। এবার ৪×৪০০ মিটার রিলে রেস।

উইণ্ট এবার রিলে রেসের প্রথম ল্যাপে দৌড়নোর জন্য জেদ ধরলেন। প্রথম ল্যাপের দৌড়েই তিনি দলকে যতদূর সম্ভব অগ্রবর্তী করে দেবেন, যাতে তাঁর দেশের তরুণ দৌড়িয়েরা বাকি ল্যাপগুলিতে প্রবল বেগে দৌড়িয়ে প্রথম হতে পারেন। উইণ্টের জেদে শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে উইণ্ট, লেইসিং, ম্যাক্‌কেনলি এবং রোডেন—এইভাবে পর-পর দৌড়বেন।

প্রথম ল্যাপে যে তীব্র গতিতে উইণ্ট দৌড়লেন, এত বেগে ৪০০ মিটার তিনি আর কখনও দৌড়ন নি। ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকের ৪০০ মিটার দৌড়ের চেয়েও কম সময়ে এই দূরত্ব তিনি অতিক্রম করলেন। প্রথম ল্যাপেই জামাইকাকে দশ মিটার অগ্রবর্তী করে দিয়ে লেইসিংকে তিনি বেটন ধরিয়ে দিলেন। উইণ্টের এই দৌড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন লেইসিং, ম্যাক্‌কেনলি এবং রোডেন। শেষ ল্যাপে রোডেনের তীব্র গতি সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে ফেলে। অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করে ৩ মিনিট ৩.৯ সেকেণ্ড সময়ে এই দৌড়ে জামাইকা প্রথম হল। এই জয়লাভের গোড়াপত্তন করে দিয়েছিলেন উইণ্ট—যে উইণ্টের জন্য জামাইকা তার আগের অলিম্পিকে জয়লাভে বঞ্চিত হয়েছিল।

সহযোগীরা উইণ্টকে জড়িয়ে ধরলেন, কাঁধে করে নিয়ে উঠলেন বিজয়-স্তম্ভে। কলঙ্ক-স্খালন হল উইণ্টের।

জয়ের নেশা

এক অসম্ভব কল্পনা নিয়ে ১৯৫২ সনের অলিম্পিকে দৌড়তে গিয়েছিলেন মাত্র একুশ বছরের ছেলে ক্রিস্টোফার চ্যাটাওয়ে। দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়ে ব্রিটেনে তিনি অগ্রবর্তী, সুতরাং অলিম্পিকে স্থান পেতে অসুবিধে হয় নি; কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ছিল অকল্পিত: সে-যুগের অবিস্মরণীয় চেক দৌড়বীর এমিল জাটোপেককে ৫০০০ মিটার দৌড়ে পরাজিত করে স্বর্ণপদকের অধিকারী হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেন নি, দৌড়ের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি আর জাটোপেকের সঙ্গে পাল্লায় পারলেন না।

সেই থেকে ক্রিস চ্যাটাওয়ের শুধু এক চিন্তা—জাটোপেককে পরাজিত করতেই হবে। প্রতিদিন নিয়মিত অনুশীলন করে যেতে লাগলেন তিনি, প্রতি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে লাগলেন। দুবছর পরে চ্যাটাওয়ে আর অনভিজ্ঞ তরুণ দৌড়বীর নন; বিশ্বের ক্রীড়াঙ্গনে চ্যাটাওয়ের নাম সর্বজনবিদিত।

জ্যাটোপেকের সঙ্গে আবার প্রতিযোগিতার সুযোগ চ্যাটাওয়ের মিলল ১৯৫৪ সালের অগাস্ট মাসে—বার্নে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে। ইতিমধ্যেই এম্পায়ার গেম্সে চ্যাটাওয়ে তিন মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অতি সহজেই প্রথম হয়েছেন।

একথা চ্যাটাওয়ে এতটুকু গোপন করলেন না যে তিনি এই প্রতিযোগিতায় জাটোপেককে পরাজিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বার্নের এই প্রতিযোগিতায় ৫০০০ মিটার দৌড় তাই সকলের কাছেই এক চরম আকর্ষণ হয়ে পড়ল। জাটোপেক আর চ্যাটাওয়ের বিশ্বজোড়া নামের কাছে আর একটি অজানা রাশিয়ান প্রতিযোগী ভ্ল্যাডিমির কুকের কথা কেউ মনেই করলেন না, অথচ এই কুকও ঠিক চ্যাটাওয়ের মতই এই প্রতিযোগিতায় জাটোপেককে পরাজিত করার জন্য মনে মনে একই স্বপ্ন দেখছিলেন।

বার্নের ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের ৫০০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় সকলেরই দৃষ্টি জাটোপেক আর চ্যাটাওয়ের ওপর—অন্যান্য প্রতিযোগিরা ভিড় বাড়াতে এসেছেন। চ্যাটাওয়ে মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে তিনি যেমন করে হোক সব সময়ে জ্যাটোপেকের সঙ্গে সমানভাবে দৌড়োবেন এবং একেবারে শেষ পর্যায়ে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে তীব্রতম বেগে ধাবিত হবেন। এই পরিকল্পনা-মত দৌড়ের সময় চ্যাটাওয়ে জাটোপোকের সঙ্গে সমান তালে দৌড়োতে গিয়ে দেখলেন যে ভ্ল্যাডিমির কুক প্রথম থেকেই প্রবল বেগে দৌড়িয়ে সকলকে অনেকখানি পিছিয়ে ফেলে অগ্রসর হচ্ছেন। এই আশ্চর্য গতি দেখে চ্যাটাওয়ে এবং জাটোপেক দুজনেই প্রথমে বিমূঢ় হলেন। কুক শেষ পর্যন্ত এই তীব্র গতি বজায় রাখতে পারবেন কি না বুঝতে না পেরে দ্বিধান্বিত হলেন। কিন্তু কুকের গতি এতটুকু কমল না দেখে তাঁরাও তাঁদের পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা ত্যাগ করে কুকের পিছু নিলেন। কোন লাভ হল না, চ্যাটাওয়ে জাটোপেককে পরাজিত করতে পারলেন বটে, কিন্তু কুক ১৩ মিনিট ৫৬·৬ সেকেণ্ডে ৫০০০ মিটার অতিক্রম করে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে প্রথম হলেন। চ্যাটাওয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হলেন জাটোপেক।

এক প্রতিদ্বন্দ্বীর পর আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী। জাটোপেককে পরাজিত করতে পেরেছেন বটে কিন্তু চ্যাটাওয়ে তবু প্রথম হতে পারেন নি। তাঁর বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী জাটোপেকের মত প্রবীণ নন, তাঁরই মত যুবক, পঁচিশ বৎসর বয়স্ক ভ্ল্যাডিমির কুক।

এবারও চ্যাটাওয়ের একই স্বপ্ন, একই আকাঙ্ক্ষা—৫০০০ মিটার দৌড়ে কুককে পরাজিত করে পূর্বপরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া।

এই সুযোগ ঠিক দুমাস পরেই এল। রাশিয়ার এক প্রতিযোগী-দল এল ইংল্যাণ্ডে—বিভিন্ন খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় ব্রিটেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। সংবাদপত্র, রেডিও এবং টেলিভিশন এই প্রতিযোগিতার নাম দিল মস্কো বনাম লণ্ডন প্রতিযোগিতা। এদের প্রচারে লোকের মুখে-মুখে এই প্রতিযোগিতা সারা ব্রিটেনে তুমুল উত্তেজনা এবং আলোড়ন সৃষ্টি করল।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৪ সনের সন্ধ্যাবেলা অনুষ্ঠিত হল ৫০০০ মিটার দৌড়। আট ল্যাপ বা রাউণ্ড দৌড়োতে হবে। প্রতিযোগী মাত্র চারজন। ব্রিটেনের পক্ষে ক্রিস চ্যাটাওয়ে ও পিটার ড্রাইভার এবং রাশিয়ার পক্ষে ভ্ল্যাডিমির কুক ও ভ্ল্যাডিমির ওকোরোকোভ।

প্রতিযোগীরা স্টার্টিং লাইনে এসে দাঁড়ানো-মাত্র লণ্ডনের হোয়াইট সিটির হোয়াইট স্টেডিয়াম একেবারে নীরব হয়ে গেল। দর্শক-মহল বিরাট কিছু ঘটার আশায় আকাঙ্ক্ষায় এত উদ্বিগ্ন এত অধীর যে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন এই চার মূর্তির দিকে।

স্টার্টার এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনের ক্যামেরা এসে পড়ল এই প্রতিযোগীদের ওপর। রেডিওয় ধারা-বিবরণী শুরু হয়ে গেল। সমগ্র বিশ্বের যে-সব ক্রীড়ামোদী এই চমকপ্রদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখায় বঞ্চিত, তাঁদের কাছে টেলিভিশন ও রেডিও পৌঁছিয়ে দিচ্ছে এই প্রতিযোগিতার প্রতি মুহূর্তের ছবি, প্রতি মুহূর্তের সংবাদ।

স্টার্টার হাঁক দিলেন—গেট সেট—

তারপরেই গর্জে উঠল তাঁর বন্দুক। চারজন প্রতিযোগীই লাফিয়ে পড়লেন মাঠের ভিতরে। কুক আবার সজোরে অগ্রসর হলেন, কিন্তু চ্যাটাওয়ে তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না। জাটোপেকের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় তিনি কুকের কথা চিন্তা করেন নি বলেই পরাজিত হয়েছিলেন, এবার আর সে ভুল তিনি করতে চান না।

প্রথম ল্যাপ যখন শেষ হল, তখনও কুক এগিয়ে। কী দারুণ তীব্র গতিতে দৌড়িয়ে চলেছেন কুক এবং তাঁর ঠিক পিছন পিছন চ্যাটাওয়ে! এত দীর্ঘ দূরত্বের দৌড়ে প্রথম পর্যায়েই এত তীব্র গতি সচরাচর দেখা যায় না, কারণ শেষ পর্যন্ত এই গতি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।
কুক আর চ্যাটাওয়ের পক্ষে কি বরাবর এই তীব্র গতিতে ছুটে চলা সম্ভব হবে?—বিস্ময়-বিমূঢ় দর্শকমহলের মনে শুধু এই এক প্রশ্ন।

প্রথম ল্যাপ দৌড়নোর সময় এক বিশ্ব-রেকর্ড। কুক ধীরে ধীরে গতি কমালেন, কিন্তু তবুও প্রতিটি ল্যাপ দৌড়নোর সময় রেকর্ড স্থাপন করে চললেন। এবার আর দর্শকমহল নীরব নয়; স্টেডিয়ামে তীব্র

উত্তেজনা, তুমুল চিৎকার, হট্টগোল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা আর চিৎকার বেড়েই চলেছে। ব্রিটিশ দর্শকেরা উৎসাহ দিচ্ছে, বাহবা জানাচ্ছে চ্যাটাওয়েকে। চ্যাটাওয়ে তখনও কুকের সঙ্গ ত্যাগ করেন নি, সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছেন।

পঞ্চম ল্যাপ শেষ হওয়ার পর হঠাৎ কুক অতর্কিতে গতি অনেকখানি বৃদ্ধি করে হতচকিত চ্যাটাওয়েকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট পিছিয়ে ফেলে দৌড়ে চললেন। এই অভাবনীয় দৌড়ে দর্শকমহল বিস্ময়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন। কুকের এই হঠাৎ-গতিবৃদ্ধির জন্য তৈরি ছিলেন না চ্যাটাওয়ে, কিন্তু কুকের কাছে কোনমতে নতি স্বীকার করবেন না প্রতিজ্ঞা করে তিনিও যথাসাধ্য তাঁর গতি বৃদ্ধি করলেন। এই তীব্রগতি দৌড়ের ফলে অন্য দুজন প্রতিযোগী অনেকখানি পিছিয়ে পড়লেন। চ্যাটাওয়ে আবার কুকের ঠিক পিছন পিছন দৌড়তে লাগলেন।

এবার দৌড়ের নাটক জমে উঠেছে। এই প্রতিযোগিতাকে চরম নাটকীয়তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে মাঠের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। আবছা-অন্ধকারের মধ্যে এক তীব্রজ্যোতি স্পটলাইট ফেলা হল কুক আর চ্যাটাওয়ের ওপর। তাঁদের দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে স্পটলাইট ঘুরে চলল।

কুক চ্যাটাওয়েকে ঝেড়ে ফেলার জন্য নানারকম কৌশলের আশ্রয় নিতে লাগলেন। কখনো বা তিনি তীব্রবেগে অগ্রসর হচ্ছেন, কখনো বা হঠাৎ তাঁর গতি কমিয়ে দিচ্ছেন; কিন্তু নাছোড়বান্দার মত চ্যাটাওয়ে কুকের সঙ্গ ছাড়লেন না।

শুরু হল শেষ ল্যাপের দৌড়। শেষ ল্যাপের ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়াম চরম উত্তেজনায় মুখর হয়ে উঠল। চারদিকে পাগলের মত চিৎকার—ক্রিস! ক্রিস! রান অন, ক্রিস!

যখন প্রায় পৌনে দুশো মিটার বাকি তখন কুক আবার তাঁর গতি বৃদ্ধি করতে লাগলেন। চ্যাটাওয়েও সেইসঙ্গে তাঁর গতি বৃদ্ধি করলেন। এবার আর পিছনে নয়, পাশাপাশি। ফ্লাশ-লাইটের আলোয় তাঁদের

ছায়া আর পৃথক করে চেনা যায় না—দুটি ছায়াই এক হয়ে গিয়েছে। যেন একটি ছায়াই তীব্রগতিতে মাঠে ছুটে চলেছে।

শেষ বাঁক নেওয়ার সময়ও দুজনে সমান সমান। পনের গজ বাকি থাকার সময় হঠাৎ চ্যাটাওয়ে তাঁর মাথা পিছনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বুক চিতিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে হঠাৎ গতি বৃদ্ধি করলেন। পরমুহূর্তেই কুককে পিছনে ফেলে চ্যাটাওয়ে অগ্রসর হলেন। এখন দূরত্ব এত কম যে আর কুকের পক্ষে চ্যাটাওয়েকে ধরা সম্ভব হল না। দর্শকদের প্রবল আনন্দের মধ্যে চ্যাটাওয়ে প্রথমে ফিতে ছিঁড়লেন।

কুকের কাছে পরাজিত হয়ে দু-মাসের মধ্যেই চ্যাটাওয়ে আবার কুককে যে পরাজিত করলেন, তা নয়—বার্নে প্রতিষ্ঠিত কুকের বিশ্ব-রেকর্ডও তিনি ভাঙলেন। তাঁর বিশ-রেকর্ড সময় হল ১৩ মিনিট ৫৭.৮ সেকেণ্ড।

অবিশ্বাস্য দৌড়

১৯২৪ সনের প্যারিস অলিম্পিক।

ব্রিটেনের অলিম্পিক দল নির্বাচনের পর্ব চলেছে। একশো মিটার ফ্ল্যাট রেসের নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় প্রথম হলেন হ্যারল্ড অ্যাব্রাহামস। সময় লেগেছিল ১১'৪ সেকেণ্ড। তখনকার অলিম্পিক রেকর্ড ছিল ১০'৬ সেকেণ্ড, বিশ্ব-রেকর্ড ১০'৫ সেকেণ্ড। অ্যাব্রাহামসের সময় সে তুলনায় অত্যন্ত খারাপ, অন্য দেশের অন্যান্য প্রতিযোগীদের দৌড়ের তুলনায় এতটুকু আশাপ্রদ নয়। ব্রিটিশ নির্বাচক মণ্ডলীর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সমস্যায় পড়লেন তাঁরা।

তার কারণ ছিল। এই প্রতিযোগিতায় ১৯২০ সনের অলিম্পিক-বিজয়ী আমেরিকার চার্লি প্যাডক সম্প্রতি শুধু যে একশো মিটার দৌড়ে বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন তা-ই নয়, প্যারিস অলিম্পিকেও তাঁর পূর্ব-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বদ্ধপরিকর। আমেরিকার নির্বাচনী দৌড়ে তিনি অনায়াসে প্রথম হয়েছেন, দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যাকসন সোলজ্। তাছাড়া আমেরিকার আর দুই উদীয়মান দৌড়বীর লোরেন মার্চিসন এবং চেস্টার বোম্যানও সম্প্রতি খুব ভাল দৌড়চ্ছেন।

তার ওপর ঐতিহ্যকেও তো আর অস্বীকার করা যায় না। সেদিন পর্যন্ত আমেরিকানরা ছাড়া অলিম্পিকের একশো মিটার দৌড়ে আর কেউ প্রথম হতে পারেন নি, কোন ব্রিটিশ তো দূরের কথা—কোন ইউরোপীয়ান পর্যন্ত নয়।

বিশেষজ্ঞেরা এই প্রতিযোগিতার ফলাফল মোটামুটি স্থির করে রেখেছিলেন: প্রথম হবেন প্যাডক, দ্বিতীয় সোলজ্ এবং তৃতীয় মার্চিসন—তিনজনেই আমেরিকান। এ রকম অবস্থায় একশো মিটার দৌড়ে আব্রাহামসের প্রতিযোগিতায় নামাই বাতুলতা; কিন্তু

নির্বাচনী-দৌড়ে নির্দিষ্ট সময়ে দৌড়তে পেরেছেন বলে তাঁকে দলে নিতে হল।

১৯২৪ সনের জুলাই মাসে প্যারিসের কোলোবেঁ স্টেডিয়ামে বিভিন্ন দেশ থেকে দলে-দলে প্রতিযোগী এসে মিলিত হলেন। ব্রিটেনের দলে এলেন হ্যারল্ড আব্রাহামস—জয়লাভের কোন আশা নেই সেটা সুনিশ্চিত জেনেও।

শুরু হল একশো মিটার দৌড়ের ছাঁটাই-পর্ব। ৫ই জুলাই প্রথম রাউণ্ডে আব্রাহামস আশ্চর্যভাবে টিঁকে গেলেন। কোনরকমে তৃতীয় হয়ে পরের রাউণ্ডে দৌড়বার সুযোগ পেলেন। ৬ই জুলাই দ্বিতীয় রাউণ্ডের দৌড়ে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে তাঁর হীটে তিনি প্রথম হলেন। সময় নিলেন ১০·৬ সেকেণ্ড—ওলিম্পিক রেকর্ডের সমান। বিশ্বাস করতে পারলেন না আব্রাহামস নিজে। তাঁর কোচ স্যাম মাসাবিনি মাথা নাড়তে লাগলেন—অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব! নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হয়েছে!

পরদিন ৭ই জুলাই বেলা তিনটের সময় সেমিফাইনাল। এইবারেই আব্রাহামসের ভাগ্য-নির্ণয় হয়ে যাবে। আব্রাহামসের হীটে আছেন গত অলিম্পিক-বিজয়ী এবং বিশ্ব-রেকর্ডধারী আমেরিকার চার্লি প্যাডক। প্রতি সেমি-ফাইনাল থেকে প্রথম তিনজনকে নিয়ে হবে ফাইনাল দৌড়।

প্রথম সেমি-ফাইনালে আমেরিকান জ্যাকসন সোলজ্‌ অতি সহজেই প্রথম হলেন। দ্বিতীয় হলেন আর এক আমেরিকান, লোরেন মার্চিসন, তৃতীয় নিউজীল্যাণ্ডের আর্থার পরিট।

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালের জন্য এসে দাঁড়ালেন হ্যারল্ড আব্রাহামস, সেইসঙ্গে চার্লি প্যাডক এবং আরও চারজন। স্টার্টারের বন্দুকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন দৌড়বীর ছুটতে শুরু করলেন, আব্রাহামস ঠিক সময়ে স্টার্ট নিতে পারলেন না। চার্লি প্যাডক ছুটে এগিয়ে গেলেন। তারপর আব্রাহামস ছুটতে শুরু করলেন, একজনের পর একজন তাঁর তীব্র গতির কাছে পিছিয়ে পড়তে লাগল। দশ মিটার বাকি থাকতে তিনি চার্লি প্যাডককে ধরে ফেললেন। তারপর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় প্যাডককে কাটিয়ে

বুক দিয়ে প্রথম ফিতে ছিঁড়লেন। প্রথম হলেন আব্রাহামস, দ্বিতীয় হলেন প্যাডক এবং তৃতীয় আর এক আমেরিকান, চেস্টার বোম্যান। আব্রাহামসের সময় লাগল আবার সেই ১০-৬ সেকেণ্ড। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু-বার অলিম্পিক রেকর্ডের সমান সময়।

আব্রাহামসের কোচ মাসাবিনির তবু যেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু দু-দুবার ভুল হবে কী করে? তাছাড়া তিনি নিজেই তো চোখে দেখেছেন পিছনে থেকেও কিভাবে আব্রাহামস চার্লি প্যাডককে পরাজিত করেছেন।

কিন্তু সেমি-ফাইনাল তো আর ফাইনাল নয়। এত পরিশ্রম আর এত মানসিক উদ্বেগের মধ্যে কি আর ফাইনালে জয়লাভ করা যায়? তাছাড়া প্যাডক একদিনে দু-বার আব্রাহামসের কাছে পরাজয় স্বীকার করবেন না। এ কথাও সকলে বলাবলি করছিল যে প্যাডক ফাইনালের দৌড়ের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখবেন বলে সেমি-ফাইনালে প্রাণপণে দৌড়োন নি।

এদিকে অলিম্পিকের ছয়টি ট্র্যাক-দৌড়ের মধ্যে পাঁচটিতেই আমেরিকা বিজয়ী হয়েছে। ষষ্ঠ হল এই একশো মিটার দৌড়,—এটিকে তারা কিছুতেই হারাতে চাইবে না। সেদিন পর্যন্ত অলিম্পিকের এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ছাড়া আর কোন দেশই তো বিজয়ী হতে পারে নি। এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করবে।

ফাইনাল দৌড় হবে সাতটার সময়, আরও চার ঘণ্টা পরে। মাসাবিনি বুঝতে পারলেন যে এই দীর্ঘ সময় আব্রাহামসকে কী মানসিক উৎকণ্ঠায় কাটাতে হবে। আব্রাহামস যে প্রথম হতে পারবেন না—সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় হলেও তিনি খুশি হবেন। ব্রিটেনের ভাগ্যে তবু তো একটি পদক আসবে।

আমেরিকার দল যখন বিশ্রাম করতে গেল, মাসাবিনি তখন আব্রাহামসের বিশ্রামের জন্য এক অদ্ভুত পথ বেছে নিলেন। খেলার মাঠ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে প্যারিস নগরী দেখাতে বেরুলেন। আইফেল টাওয়ার, সীন নদী, রাষ্ট্রপতি ভবন,

জাদুঘর প্রভৃতি দেখে যখন তাঁরা ফিরলেন, তখন আব্রাহামসের মনের ভার নেমে গিয়েছে। একেবারে স্বাভাবিক সহজ হয়ে ফিরে এসেছেন তিনি।

ঠিক সাতটায় শুরু হল ফাইনাল। একশো মিটার দৌড়ের জন্য ছয়জন সার দিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম লেনে প্যাডক, দ্বিতীয় লেনে সোলজ্, তৃতীয়তে আব্রাহামস, চতুর্থতে মার্চিসন, পঞ্চমে বোমান এবং ষষ্ঠে পরিট। দুদিকে দুজন করে আমেরিকানকে দাঁড়াতে দেখে আব্রাহামস প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন; কিন্তু উপায় কী, যখন ফাইনালে ছ-জনের মধ্যে চারজন আমেরিকানই উঠেছেন?

স্টার্টার হাঁক দিলেন,—গেট সেট!—তারপরেই বন্দুক গর্জে উঠল।

ছয়জন প্রতিযোগীই একসঙ্গে মাঠের ওপরে লাফিয়ে পড়লেন। শুরু হল অলিম্পিকের দ্রুততম দৌড়। প্রথম পঁচিশ গজে ছয় জনই সমান। প্যাডক এবং সোলজ্ দুজনেই সুন্দরভাবে ছুটছিলেন, দর্শকদের সকলেরই দৃষ্টি এই দুই আমেরিকান দৌড়বীরদের ওপর। সকলের ধারণা,—এই দুজনের মধ্যে একজন প্রথম হবেন। কিন্তু আব্রাহামসও পিছিয়ে ছিলেন না।

পঞ্চাশ মিটারের মাথায় দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। এই সময়ই প্যাডকের প্রতিপক্ষ-বিধ্বংসী ক্ষিপ্র গতি দেখা যায়। প্যাডক তাঁর সমস্ত সঞ্চিত শক্তি একত্রিত করে গতিবেগ বৃদ্ধি করলেন, কিন্তু সেই বিদ্যুৎগতির সঙ্গে সমানভাবে গতিবেগ বৃদ্ধি করলেন সোলজ্, আব্রাহামস আর পরিট। এক মুহূর্তের জন্য তাঁরা যেন এক সরল রেখায় এসে দাঁড়ালেন, তারপর একটি লোককে সেই সরল রেখা ভেঙে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সেই লোকটির গায়ে সাদা গেঞ্জি, বুকে তার ব্রিটিশ পতাকা আঁকা।

দর্শকেরা বিহ্বল হয়ে পাগলের মত চিৎকার করতে লাগলেন—আব্রাহামস্! আব্রাহামস্! উত্তেজিত দর্শকেরা আনন্দ-কলরোলের মধ্যেই মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, বুক চিত করে, হাতদুটোকে টান করে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সবার আগে আব্রাহামস ফিতে ছুঁলেন।

ঠিক তাঁর পায়ে-পায়েই এসে পৌঁছুলেন সোলজ্ এবং একটু পরেই পরিট। চতুর্থ হলেন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান এবং গত অলিম্পিক-বিজয়ী প্যাডক।

স্যাম ম্যাসাবিনি দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন আব্রাহামসকে। আবার তাঁর সময় সেই ১০·৬ সেকেণ্ড—অলিম্পিক রেকর্ডের সমান। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিন-তিনবার অলিম্পিক রেকর্ডের সমান সময়ে আর কে দৌড়তে পেরেছেন?

শুধু ব্রিটিশ মহলে নয়, ইউরোপীয় মহলেও প্রতিযোগীদের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের বন্যা বয়ে গেল। একশো মিটার দৌড়ে আমেরিকার আধিপত্য এই প্রথমবার ক্ষুণ্ণ হল।

প্রথম তিনজনের মধ্যে মাত্র একজন আমেরিকান এবং তিনি হয়েছেন দ্বিতীয়। আব্রাহামস শুধু প্রথম ব্রিটিশ নন, প্রথম ইউরোপীয়ান যিনি অলিম্পিকের একশো মিটার দৌড়ে স্বর্ণ-পদক লাভ করলেন।

তারপর ১৯৬০ সনের অলিম্পিক পর্যন্ত মাত্র আর দুবার—একবার ১৯৬০ সনে জার্মানির আর্মিন হ্যারি, আর একবার ১৯৬০ সনের অলিম্পিকে রাশিয়ার........আমেরিকানদের হাত থেকে এই গৌরব ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।
